ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

কর্ত্তৃক

কুটীরে যোগভক্তিবিষয়ক উপদেশ।

প্রথমার্দ্ধ।

[১৭৯৭ শকের ১৪ ফাল্গুন হইতে ১৭ চৈত্র পর্য্যন্ত।]

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮০৮ শক। পৌষ।

মূল্য ৷৹ আনা

বিজ্ঞপ্তি।

শ্রীমদাচার্য্য দেব আজ দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে যোগ ও ভক্তি শিক্ষার্থিগণের প্রতি যোগ ও ভক্তিসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহা এ যাবৎ আমরা পুস্তকাকারে প্রকাশ কবিতে পারি নাই বলিয়া সাধারণ সমীপে অপরাধী আছি। অনেকে আমাদিগকে অনেক বার ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত এই সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমরা সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। এবার উপদেশনিচয়ের অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রকাশিত হইল। সময় ও অবসরাভাবে আমরা সমুদায় উপদেশ গুলি একেবারে মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। ভরসা করি, সত্বর আমরা অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ এবং কর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ ও ব্রহ্মযোগোপনিষৎ ও সাধ্যসাধনোপনিষৎ নামক যোগসম্বন্ধে অতিরিক্ত উপদেশ গুলি মুদ্রাঙ্কন করিব। এই গ্রন্থ সাধক মাত্রেরই হৃদয়ের অমূল্য ধন। তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যোগ ভক্তিতে সম্পন্ন হইবেন, এই কামনায় আমরা গ্রন্থ প্রচার করিলাম, সিদ্ধিদাতা আমাদিগের এই কামনা পরিপূরণ করুন।

সূচীপত্র।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

অর্থাৎ

কুটীরে আচার্য্যের উপদেশ।

ভক্তি।

ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভক্তি কি স্থিরচিত্তে অনুধাবন করা উচিত। যোগ বা ভক্তির পথে কি চাই, তাহা স্পষ্ট জানা প্রয়োজন। অগ্রে জানা না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। এ পথের বাঞ্ছিত ফল কি, ভক্তির লক্ষণ কি, কিরূপে উহা সাধিত হয়, কোন্ পদার্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তি উপস্থিত হয়, এ সকল সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে।

ভক্তি কি? হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। কোন্ প্রকারের পদার্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তি উদিত হয়? সত্যং শিবং সুন্দরং পদার্থঃ যে পদার্থে কেন সত্য শিব সুন্দর ভাব থাকুক না, তাহা দেখিয়াই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ ভক্তি ভাববিশেষে; সত্য, শিব, সুন্দর এই

তিন গুণ উহার উদ্দীপক। ভক্তি এই তিন গুণ ভিন্ন আর কিছু চায় না। যেখানে এই তিন গুণের একটিরও অভাব আছে, সেখানে ভাবের পূর্ণতার ব্যাঘাত এবং ভক্তির বিকার উপস্থিত হয়। ভক্তি অবিকৃত কোথায়? সেইখানে যেখানে এক জন পুরুষ, যিনি সৎ, মঙ্গল ও সুন্দর, তাঁহাতে উহা অর্পিত হইয়াছে। এই পুরুষ কিসে সুন্দর? মঙ্গলে এবং দয়াতে। সেই দয়া কাহার? যিনি এক মাত্র সৎপদার্থ তাঁহার।

ভক্তি বিশ্বাসমূলক। ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না। কারণ ভক্তির প্রধান অবলম্বন দয়া ও মঙ্গল ভাব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের ধারণা বিশ্বাস ভিন্ন হয় না। বিশ্বাস ভক্তি বিনা থাকিতে পারে, ভক্তি বিশ্বাস বিনা থাকিতে পারে না। যেখানে ভক্তি আছে, সেখানে বিশ্বাস অন্তরে নিহিত আছে, ইহা নিশ্চয় যদি ভক্তিতে বিশ্বাসের অল্পতা হয়, তবে নিশ্চয় উহা বিকৃতা হইয়া যায়। ভক্তিতে সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত জানা চাই,—এই যাঁহাকে দেখিতেছি তিনি সৎ, তিনি আছেন, নিশ্চিত আছেন, তিনিই মঙ্গলময় এবং দয়াল পিতা। সত্য আধার, তাঁহাতেই দয়া আরোপিত হয়। এই আরোপিত দয়া সুন্দর ভাব ধারণ করে। এই সৌন্দর্য্য আর কোন সৌন্দর্য্য নহে, দয়ার সৌন্দর্য্য। সত্য আধারে দয়া পড়িলে উহা সুন্দর হইবেই হইবে। ইহা

কল্পনা নহে; কারণ যথার্থ আধারে দয়া আরোপিত হইয়া সুন্দর বস্তুর গঠন হয়। ঈশ্বরের এইরূপই গঠন। কারণ যিনি দয়াতে সুন্দর হইয়াছেন, তিনি দয়াতে অনন্ত, সুতরাং সৌন্দর্য্যেও অনন্ত। যেখানে সৌন্দর্য্য আছে, সেইখানে আকর্ষণ আছে। যিনি সৎ, মঙ্গলময়, সুন্দর, তিনি হৃদয়কে টানেন। এই টানে আকৃষ্ট হওয়ার ভাবই অনুরাগ, ভক্তি, প্রেম।

সত্য, শিব, সুন্দর, এই তিনেতে যিনি এক, ভক্তি তাঁহাকেই দেখে, তাঁহাকেই চায়। ভক্তি শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা এই যে, ভক্তির মূল স্থির চাই, ভক্তির মূল ঠিক করা উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মূলে স্থাপিত নহে তাহা দুই পাঁচ বৎসর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। যাহার ভক্তির ভূমি স্থিরতর, যাহার ভক্তি সত্য, শিব, সুন্দরে প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভক্তি অনন্তকাল পূর্ণতা লাভ করে। যদি এই তিন গুণের একটিরও ব্যাঘাত হয়, সমুদায় সাধন, ভজন, পূজা, অর্চ্চনা ব্যর্থ হয়। সত্যে ভক্তি ক্ষীণভাবে অবস্থিতি করে, দয়াতে উহার কোমলতা বৃদ্ধি পায়, ক্রমে প্রবল হইয়া উহা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতারূপে পরিণত হয়। সত্যে বিশ্বাস ও ভক্তির আরম্ভ, কিন্তু উহা তখন দুর্ব্বল ভাবে অবস্থান করে। দয়াতে প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। সত্যে ভক্তির বাল্যকাল, এই বাল্যকাল ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া যৌবন প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে পরিণত বয়স্ক হইয়া দয়ার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়।

ভক্তির আকার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মধুরতাময়। সৌন্দর্য্যে মগ্নভাব, প্রগল্‌ভা ভক্তি। উহা স্রোতের ন্যায় ভক্তকে টানিয়া লইয়া যায়, সৌন্দর্য্যে ভক্ত একেবারে জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। দয়া ভাবিতে ভাবিতে পুরুষ স্বন্দর হইয়া দাঁড়ান। সেই সৌন্দর্য্যে ভক্ত একেবারে বিমোহিত হইয়া যান। "সত্যং শিবং সুন্দরং" ভক্তি পথের মন্ত্র, এই মন্ত্র জপে আশু সিদ্ধি হয়।

যোগ।

কোন পথের পথিক হইলে লোকে কোথায়, কত দূর যাইতে হইবে, অগ্রে স্থির করিয়া লয়, অন্যথা পথের মধ্যে একটি স্থানকে গম্যস্থান বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে। সুতরাং যোগপথে যাইবার পূর্ব্বে যোগের লক্ষণ কি, যোগ কি, জানা আবশ্যক। যোগশব্দের অভিধানের অর্থ, দুই স্বতন্ত্র স্থানে স্থিত পদার্থের একত্র মিলন। দুয়ের সংযোগ, দুয়ের একত্র মিলন, যোগ। যোগে দুটি পদার্থের আবশ্যক, এবং সেই দুই স্বতন্ত্র পদার্থের একত্র মিলন হইলে যোগ হয়। পবিত্রতা অপবিত্রতা, পুণ্য পাপ, এ এক ভিন্নতা, সৃষ্ট ও স্রষ্টা, অল্পশক্তি অনন্তশক্তি, এ আর এক ভিন্নতা। ইহার একটিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিয়া ভিন্নতা হইয়াছে, আর একটি প্রকৃতিতে ভিন্নতা। ইচ্ছায় বিরোধ

সহজ নহে, উহা শত্রুতা। এই পাপমূলক শত্রুতা, বিবাদ, বিরোধ, যুদ্ধ যাহাতে দূর হয় এ জন্য যোগের আবশ্যক। এই যোগ দ্বারা বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মিলন হয়। যোগের ইহাই লক্ষ্য। শত্রুতা বিনাশ করিয়া উভয় পদার্থের মিলন হইলেই যোগ হইল। প্রথমতঃ কালদেশসম্বন্ধে যে দূরতা থাকে তাহা যোগে যত্ন করিতে করিতে নিকট হয়, কারণ উপাসনাসময়ে যে সামীপ্য অনুভূত হয় তাহাই যত্ন দ্বারা অন্য সময়েও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে সাধু-মণ্ডলীতে, পুষ্পে, কাননে বা পর্ব্বতে যে সামীপ্য অনুভূত হইয়াছিল তাহা অন্যত্রও অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান ভাব এবং কার্য্যে আমাদিগের ঈশ্বর হইতে যে দূরতা, উহাই এইরূপ সাধন দ্বারা নিরস্ত হয়। এইরূপে ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে দূরত্ব চলিয়া গিয়া ঈশ্বর এবং জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত হয়, এই একত্ব বা মিলনই যোগ। এইরূপে যাহার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন হইয়াছে তাহাকেই যোগী বলা যায়। অন্যথা যে অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া সেখানে অবস্থান করে, তাহাকে কখন যোগী বলা যায় না। ব্রহ্মে যোগী অবস্থিত, যোগীতে ব্রহ্ম অবস্থিত, এইরূপ যোগযুক্ত হইলে যোগী পরম নিবৃত্তি লাভ করেন।

যোগ ভক্তির সাধারণ ভূমি।

যোগের লক্ষণ, ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। যোগ এবং ভক্তির এক স্থলে মিল আছে তাহাই তোমাদিগকে একত্র বসাইয়াছি। ভক্তির মূল মন্ত্র "সত্যং শিবং সুন্দরং," যোগ ঈশ্বরের নৈকট্যানুভব। ঈশ্বরকে সৎ বলিয়া উপলব্ধি, এ দুয়েরই প্রথম পাঠ। এ স্থলে দুজন এক। শিব সুন্দরে, গভীররূপে নিমগ্ন হইলে, ভক্তের যোগী হইতে ভিন্নতা উপস্থিত হয়। বিশ্বাসভূমি, শ্রদ্ধাভূমি, যোগী এবং ভক্তের এক। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা ভক্তি পরিপক্ক হয় না, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা যোগেও অধিকার জন্মে না। অতএব শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের বিষয় তোমাদিগের দুজনেরই শ্রবণ করা আবশ্যক।

ঈশ্বরের সত্তাতে নিঃসংশয় না হইলে ভক্তি বা যোগ কিছুই সম্ভব নহে। অতএব দুজনেরই প্রথম পাঠ "সৎ"। সৎ শব্দের অর্থ কি? সৎই বলা যাউক আর সত্যই বলা যাউক, ইহার গূঢ় অর্থ জানা আবশ্যক। সৎ কি? না যাহা "যথার্থ আছে"। ঈশ্বর যথার্থ আছেন; পদার্থরূপে, সৎ পদার্থরূপে আছেন। যাহা নাই তাহা অসৎ, অসৎ মিথ্যা। ঈশ্বর নাই নন, এই প্রথম। ইহার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা দর্শন। সাধনের নিম্নতম অবস্থায় "নাই তাহা নয়" এই আরম্ভ, সাধনের পরিসমাপ্তি দর্শন। মধ্যমাবস্থায়

"ইনি নন তাহা নয়।" এই তিনটি সোপানে ক্রমে উত্থান হইয়া থাকে। 'তিনি নাই তাহা নহে,' এই হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে, 'তিনি আছেন' স্বীকার করিয়া ক্রমিক উন্নতি চাই, পূর্ণ নিঃসন্দেহ চাই। প্রথমাবস্থায় ছায়া এবং কল্পনার ভাব, অস্থিরতা, অসমান ভাব, অনিশ্চিত জ্ঞান, চঞ্চল দীপ-শিখার ন্যায় চঞ্চল বুদ্ধি। মধ্যমাবস্থায় 'নাই'র দিকে হ্রাস, হাঁ'র দিকে বেশী। "আছেন," ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হইলে দর্শনের আরম্ভ হইল, ক্রমে ইহা উজ্জ্বল হইবে। প্রাতে একরূপ, দ্বিপ্রহরে একরূপ। আরম্ভে 'নাই' অস্বীকার। সৎ—অসৎ নন, এই আরম্ভ। তিনি ছায়া, কে বলিল? দর্শনের সাধন, সৎস্বরূপের সাধন এইরূপে হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ বুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত দর্শন হয় না। মধ্যমাবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে অল্প আলোক পড়ে, সদসতের মিলন থাকে, সতের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে অসৎ থাকে, অবশেষে শেষটি কমিয়া যায়।

জ্ঞানীর নিকটে বর্ত্তমানতা সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরপূজা বর্ত্ত-মানতার পূজা, একই। 'তিনি আছেন, তাঁহার যে গুণ থাকে থাক, তিনি আমার সঙ্গে আছেন,' এইটি করিলে কল্পনাবর্জ্জিত সাধন হইবে। যদি অসৎ ঈশ্বর হইতে বাঁচিতে চাও, তবে যাহাতে বর্ত্তমানতা ধরিতে পারা যায় তজ্জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিবে। যদিও বর্ত্তমানতার সঙ্গে কোন গুণ যোগ দিলে ব্রহ্মদর্শন স্থলভ হয়, কিন্তু

ওরূপে রং দিয়া সাধক জাজ্বল্যমান পুরুষসত্তাতে যত আরোপ করিবেন, তত বিপদের সম্ভাবনা। কেবল যিনি বর্ত্তমানতার পূজা করেন তিনিই নিরাপদ। সর্ব্ব প্রকারের মূর্ত্তি ছাড়িতে হইবে, সুতরাং কেবল বর্ত্তমানতা গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানতাই ব্রাহ্মের পূজনীয় ব্রহ্ম। কেবল বর্ত্তমানতা ধরা, সাধন ভিন্ন হয় না। সাধন কি? নিরাকার যিনি তাঁহাকে কি প্রকারে ধারণ করিব? এখানে ধারণ করিবার বিষয় আছে। এই তিনি এখানে আছেন, নাই নহে, এখানে এক জন আছেন,—এইরূপ আলোচন করিতে করিতে পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রথম তাঁহাকে শুক্ল রং বর্জ্জিত আকাশের তুল্য গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য তিনি "আকাশ" নাম পাইয়াছেন। গুণ নাই, বর্ণ নাই, যত দূর আকাশ তত দূর আছেন এই ভাবটিকে অধিকার করিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে ইহাতে কল্পনা আসিবে না। নির্জ্জনে অন্ধকারে আমার সমক্ষে এক জন বর্ত্তমান আছেন, এই যে 'আপনি ছাড়া আর এক জন' এই ভাবটি প্রথম শিক্ষা। ইহার আরম্ভ কঠিন, শেষে সুলভ। কল্পিত পথে অগ্রে মধু পশ্চাৎ বিরস, যথার্থ পথে প্রথম কণ্টক পরে পুষ্প। সর্ব্ব প্রথমে সেই স্থির সত্তা গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল পদার্থ সৎ এইরূপ ধারণ করিতে হইবে। তিনি ভাল বাসেন কি ভাল বাসেন না, তথাপি আছেন, তিনি দেখেন

কি দেখেন না তথাপি আছেন, তিনি শাস্তি দেন কি না দেন তথাপি আছেন, তিনি ক্রিয়াবান্ হউন বা ক্রিয়া-হীন হউন তথাপি আছেন। এরূপে গ্রহণ কঠিন, কিন্তু এরূপে গ্রহণ করিতে যদি ছয় মাসও অতীত হয় তথাপি করিতে হইবে, কেন না এরূপ করিয়া গ্রহণ করিলে সব সুলভ হইবে। কল্পনা লইয়া ৬ বৎসর সাধন করিলেও যথার্থ ঈশ্বর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞানী কল্পনার পূজাকে পৌত্তলিকতা বলেন। এই সৎপদার্থ গ্রহণ কি, জ্ঞান প্রতিভাত হইলে বুঝিতে পারা যায়, অন্যথা বুঝিতে পারা যায় না। তবে উপমাতে এই বলা যায় যে, যেমন ছাদের উপরে অন্ধকারে আমি আছি, আর এক জন আমার চারি দিকে আছেন, এই ভাবিয়া যে মনের অবস্থান্তর হয়, ভয় উপস্থিত হয়, উহাই উহার প্রথম লক্ষণ। এইরূপ অনুভবে মন চমকিত ও স্তম্ভিত হয়, হৃদয় গুরুত্ব অনুভব করে, লঘুতা চলিয়া যায়।

এখানে উপমা বিফল। শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, উহা অনুভব করিতে হয়। এই অদৃশ্য সত্তাকে স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে কঠোরতা চলিয়া গিয়া আহ্লাদের উদয় হয়। ঘরে থাকি আর বাহিরে থাকি, তখন কেবল সত্তানুভব। "তুমি আছ" এই মন্ত্র তত ক্ষণ তত বার চিন্তা করিবে, যত ক্ষণ না স্তম্ভিত ভাব আসে। এইরূপ স্মরণে ভয় ও ক্রমে আহ্লাদ প্রথমে হউক বা না হউক,

অন্ততঃ একা থাকিলে যে ভাব হয়, তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হয়। আমি একা, এইটি ভাবিলে যে ভাব উপস্থিত হয়, উহাই নাস্তিকতার অবস্থা। ফলতঃ আমি আছি, আর কেহ নাই, ইহা নাস্তিকতা, ইহার বিপরীত আস্তিকতা। প্রথমাবস্থায় 'এখানে কেহ নাই তাহা নয়' ইহাতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে জীবনের প্রত্যূষাবস্থায় এক জন থাকিলে যে ভাব হয় সেই ভাব উপস্থিত হয়। অন্ধকারে এক জন স্পর্শ করিলে যেমন গা ছ্যাঁক করিয়া উঠে, ইহাতে সেই ভাব হয়। কেহ যেন এখানে লুক্কায়িত আছেন, গুপ্ত আছেন, এইরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। কিরূপে, কি ভাবে, কে আছেন জানি না, অথচ আছেন এই প্রথম ভাব। দৃষ্টান্ত দিতে, অন্ধকারে ভূতের ভয়কে দৃষ্টান্ত স্থলে আনিতে পারা যায়। কোন শ্মশানে প্রবেশ করিলে কেহ ভয় বারণ করিতে পারে না। সেই দৃষ্টান্ত লইলে বুঝিতে পারা যায়, আমি ছাড়া অদৃশ্য কেহ আছে বুঝিলে মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। কিন্তু সেই সময়ে যদি অন্য কেহ তথায় আসে তবে আর ভয় থাকে না। কেন না, তখন দৃশ্য পদার্থে মন অভিনিবিষ্ট হয়।

সত্তানুভবে স্মরণ মাত্র অবলম্বন। এই স্মরণ ঈশ্বর দর্শনের প্রথমাবস্থা। এই স্মরণ হইতে সুন্দর সুগঠিত ভাবের উদয় হয়। ব্রহ্মদর্শনের জন্য স্মরণ প্রধান সহায়। স্মরণে দ্বৈত ভাব অনুভূত হয়। সত্তা প্রথম অদৃশ্য ছিল,

এখন অনুভব হইল। মনে ইচ্ছা হইল উহা ভাল করিয়া ধরিব। এখানে একাকিত্ব অঙ্গীকারের ভাবটিকে প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। ভাব আন্তরিক, সত্তা বাহিরে। যখন সত্য কথঞ্চিৎ অনুভব হইল, তখন " সত্যং " বলিতে অধিকার হইল। মনে রাখিও এইটি সূত্রপাত। অন্ধকার দেখিলে হাতে প্রদীপ লইয়া দেখিতে স্বভাবতঃ কৌতূহল হয়। বাহিরে যখন সত্তার ভাব প্রস্ফুটিত হয়, অন্তরে গাম্ভীর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবকে স্থায়ী করিবার জন্য মনের প্রধান বৃত্তি স্মরণ পরম বন্ধু। " আমি ছাড়া এক জন ভিতরে চারি দিকে আছেন " এই শব্দ ক্রমান্বয়ে সাধনার্থ আবৃত্তি করিতে হইবে এবং ভাবগুণবিবর্জ্জিত সত্তা ভাবিতে হইবে। তত বার উচ্চারণ করিবে, যত বার ভাব ঠিক না হয়। সাধনের একটি সঙ্কেত এই, ক্ষুদ্র কখন ব্যাপ্তভাব ধারণ করিতে পারে না, সঙ্কীর্ণ ভাবে আবার পৌত্তলিকতা হয়। সৎ সর্ব্বব্যাপী, সাধনের অবস্থায় সাধক তাঁহাকে অল্পাকাশে ধারণ করিবেন। এই অল্প স্থানে আবদ্ধ রাখিলে পৌত্তলিকতা হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাকাশে স্মরণ, অল্পাকাশে ধারণ। অনন্ত সত্তা জ্ঞানে, ধারণ অল্পস্থানে।

সংযম।

কোন ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সংযম আবশ্যক। যেটি সঙ্কল্প করিয়া ব্রত গ্রহণ করা যায়, সেইটির প্রতি সমস্ত বুদ্ধি, অনুরাগ, সমস্ত চেষ্টা সম্বদ্ধ হয়, এ জন্য সংযম আবশ্যক। এ পৃথিবীতে সিদ্ধির পক্ষে বিভক্ত মন বিশেষ প্রতিবন্ধক। একটি স্থিরতর সঙ্কল্প না থাকিলে, পাঁচটি সঙ্কল্পের দিকে মন ধাবিত হয়, ইহাতে কোন দিকেই সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এ জন্য ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে সংযম ঈশ্বরের আদেশ। বুদ্ধি. যত্ন, হৃদয়, মন সমুদায় শক্তি এক স্থির সঙ্কল্পের দিকে নিয়োগ কর, পরে ব্রত গ্রহণ করিবে। এক পক্ষ পরে ব্রত গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই এক পক্ষে বিশেষরূপে সংযত হইতে হইবে।

বুদ্ধি স্থির করিয়া মনঃসংযোগ কর। মনকে স্থির করিবার পক্ষে দুইটি শত্রু। ১ম অন্য চিন্তা, ২য় পাপ চিন্তা; কিংবা ১ম অন্য চিন্তা, ২য় ইন্দ্রিয় প্রাবল্য। একাগ্রতা উদ্দেশে সংযম। বিক্ষিপ্ত মনকে এক দিকে নিয়োগ—সংযম। ইহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করা আবশ্যক। ভক্তিই অভিপ্রেত হউক, বা যোগই অভিপ্রেত হউক, অন্য চিন্তার উপরে জয় লাভ করিতেই হইবে। উপাসনার সময়ে এক জনের অন্য চিন্তা আসিতে পারে, কিন্তু যোগ ভক্তিতে অন্য চিন্তা আসিতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে

অন্য চিন্তা করা পাপ নয়, কিন্তু সাধকের পক্ষে উহা অপরাধ। ঈশ্বর চিন্তা পাঁচ মিনিট করিতে না করিতে অন্য চিন্তা আসিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাকে থাকিতে দেওয়া পাপ। ইহাতে অঙ্গীকার লঙ্ঘন হয় বলিয়া পাপ। অল্পমাত্রও অনধিকার চিন্তায় সঙ্কল্পস্থিরতার ব্যাঘাত হয়। দীপশিখার নিকটে সামান্য বায়ু আসিলেও উহা নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। মনের কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্যেও দৃঢ়তা যায়, তেজের অল্পতা এবং অনুরাগের হীনতা হয়। সুতরাং অন্য চিন্তাকে বিষ-বৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্যবধান দূর করা যোগের উদ্দেশ্য, এক বস্তুতে অনুরাগ ভক্তির উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে অন্য ভাব, অন্য চিন্তা শত্রু, কেন না, অবিভক্ত মন ভিন্ন অনুরাগ হয় না, যোগ হয় না। ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে যে বিভাগ তাহাকেই পূর্ব্বে শত্রুতা বলা হইয়াছে। এ বিভাগ আর কিছু নহে, অন্য চিন্তা। স্থির সমুদ্রে কিছু পড়িলেই চাঞ্চল্য আইসে। সাধকের মন এইরূপ অল্প অন্য চিন্তাতেই দুই পথে ধাবিত হয়, চেষ্টা অনুরাগ বিভক্ত হইয়া পড়ে।

অন্য চিন্তাকে লোকে পাপ মনে করে না। কিন্তু কোন্ সময়ে ইহা পাপ বলিয়া গণ্য? ধ্যান, উপাসনা, ভক্তি ও সংযম সময়ে। এ সময়ে যদি সচ্চিন্তা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পর্কীয় চিন্তাও আইসে তাহাও পরিত্যাজ্য। কারণ যে চিন্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করা যায়

তাহাতে নিশ্চয় অপরাধ। যদি কোন চিন্তা ভাবযোগের নিয়মানুসারে আইসে, উহা পোষণ করা পাপ। ভাল চিন্তাও আহ্বান করিয়া আনিয়া মুহূর্ত্তমাত্র রক্ষা করাও অপরাধ। এ সাধন দুরূহ হইলেও বৎসর ব্যাপিয়া আত্মাকে আয়ত্ত করিবে বলিয়া যখন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ সেই সময়েই অঙ্গীকার করিয়াছ যে, তোমাদিগের আর অন্য চিন্তায় অধিকার নাই। এরূপ অঙ্গীকার করিয়া অন্য চিন্তাকে অধিকার দেওয়া সত্যলঙ্ঘন। বিশেষতঃ এরূপ হইতে দিলে মনের অবিভক্ত ভক্তি যোগ জন্মিবে না, এবং তদ্ভিন্ন তোমাদিগের সাধন সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং স্থির হইল অন্য চিন্তা, পাপচিন্তা; ১ম-সত্য লঙ্ঘন, ২য় সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত।

মন বিশেষতঃ অল্পাধিক স্বভাবতঃ চঞ্চল। মন কর্ম্মশীল, সুতরাং উহাতে চিন্তা অধিক। যে মন সংযম করে নাই, সে অন্যচিন্তাপ্রিয়। এই মনকে সংযম করিতে বহু অভ্যাস, বহুকালের অভ্যাস চাই। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি যদি এক মিনিট অন্য চিন্তা করেন, অন্যের পক্ষে চুরী করা যেমন পাপ, তাঁহার পক্ষে সেই এক মিনিটের চিন্তা তেমনি পাপ। তোমাদের এখনকার অবস্থা এরূপ নহে। তোমাদিগকে এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে। সঙ্কল্পবহির্ভূত চিন্তা আসিবামাত্র তাহাকে দূর করিয়া দিবে। সাধনের অবস্থায় চিন্তা আসিবামাত্র দূর করিয়া দিতে

দণ্ডায়মান থাকা এবং দূর দূর বলিয়া তাড়াইয়া দেওয়াতে ঈশ্বর তাহাকে নিরপরাধিরূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং এ বিধি অবশ্য পালনীয়। অন্য চিন্তা আসিবামাত্র আত্মা গম্ভীর ভাবে 'দূর হ' শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহার সুফল দেখিয়া তোমরা অবাক্ হইবে। এ কথা উচ্চারণে সরলতা এবং গাম্ভীর্য্য চাই। সরল গম্ভীর ভাবে এ কথা উচ্চারণ করিলে দেখিতে পাইবে, এ কথার মধ্যে বল আছে। আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনার সময়ে, নির্জ্জন সাধনের সময়ে, প্রেম ভাবের মধ্যে, চিন্তামগ্ন যোগের অবস্থাতে অন্য চিন্তা আসিতে পারে। ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা আসিল কি অপরাধ-সম্বন্ধে চিন্তা আসিল বিচার করিও না। যে পরিমাণে উহা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিল সেই পরিমাণে উহা শত্রু, উহা অপরাধ। এই বিধি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। যখনি কোন বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনি "দূর হ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহাকে দূর করিয়া দিবে।

ইন্দ্রিয় প্রাবল্য।—এটি আরো ভয়ানক। মন সংযত কর। বিরুদ্ধ চিন্তা হইতে আপাততঃ মন অস্থির না হউক, কিন্তু জানিও সকল অবস্থাতে ইন্দ্রিয়সংযম একান্ত আবশ্যক। ধ্যানাদি কঠিন এবং অসম্ভব হইবে, যদি কাম, লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি অবস্থিতি করে। যে স্বভাবে এ সকল প্রবল তাহাতে স্থিরতা, শান্তি অসম্ভব। এ জন্য চতুর্গুণ যত্নে

ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইবে। তোমরা দুই জন ইন্দ্রিয়-সংযমে বিশেষ চেষ্টা করিবে। আহার স্নানাদির নিয়মকে সংযম বলে না, কঠোর ব্রতাদি দ্বারা প্রিয় ইন্দ্রিয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখা সংযম। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম পরে বলা যাইবে। এখন এই মাত্র বলিতেছি, তোমরা মনকে অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্তি করিতে যত্ন না করিলে, ইন্দ্রিয়সংযমে কৃতসঙ্কল্প না হইলে, ব্রত গ্রহণে অক্ষম হইবে। এই পক্ষ পরে যদি দৃষ্ট হয় অপর চিন্তা এবং রিপুসম্বন্ধে মনের দ্বার অবরুদ্ধ হয় নাই, তবে সংযমের সময় আরো বিস্তৃত করিতে হইবে। এই সংযমের অবস্থার উপরে এক বৎসরের ফলাফলের বীজ রোপিত হইবে। ইন্দ্রিয় উত্তেজনা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। সংযমকালে সাধক সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছে, ইহা দেখিয়া ঈশ্বর তাহাকে নিরপরাধ স্থির করিতে চান। তিনি তোমাদের চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইলে তবে তোমরা ব্রতগ্রহণে অধিকারী হইবে। যদি রিপু প্রবল থাকিল, সংযম হইল না। বাহ্যিক উপায় বৃথা, তোমরা অন্তর দেখিবে। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে চিন্তা আসিলেও "দূর হ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। দুইয়েরই একই মন্ত্র। সম্পূর্ণ যত্ন চেষ্টা ও ভাবে "দূর হ" বলিলে সাধক নিরপরাধিরূপে গণ্য হন। ইন্দ্রিয়প্রাবল্য দীক্ষাপথ অবরুদ্ধ করে। এ স্থলে সম্পূর্ণ চেষ্টা দীক্ষাপথে

প্রবেশের অধিকার। যে ব্যক্তি কুভাব কুচিন্তা আসিলে গম্ভীরভাবে প্রার্থনাশীল অন্তরে বজ্রধ্বনিতে "দূর হ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, ঈশ্বর তাহাকে অধিকারী জ্ঞান করেন। পরে তিনি সাধককে এই সকল চিরকালের জন্য সংহার করিবার ঔষধ অর্পণ করেন। তোমাদিগকে অদ্য এই বিশেষ করিয়া বলিতেছি, তোমরা এরূপ যত্ন কর যে, অন্য চিন্তা, পাপচিন্তা, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য তোমাদের সাধনের ব্যাঘাত না হয়। এ সম্বন্ধে প্রথমতঃ তোমরা নিজে সাক্ষী হইবে পরে তোমাদের ভ্রাতা ভগিনী সাক্ষী হইবেন। তোমাদের চিত্ত স্থির সমাহিত হইল কি না এ বিষয়ে তোমরা সাক্ষী এবং তৎপর চারিদিকের লোক ইহার সাক্ষী হইবে। এ কয় দিন তোমরা সাবধানে ধৈর্য্য শিক্ষা কর। সাধনের সময়ে যদি তোমাদিগের মন আয়ত্ত হয়, অন্য সময়ের জন্য ভাবনা নাই। সমুদায় দিন ঈশ্বরের হইয়া থাকা সুলভ নহে, কিন্তু উপাসনাব্যতিরিক্ত সময়েও চিন্তাতে বিরুদ্ধ চিন্তা আসিতে না দেওয়া আবশ্যক।

স্থৈর্য্য সাধন।

চিত্তের স্থিরতাসম্বন্ধে যে সাধন সেই সাধনের আরম্ভ স্থানেতে, তার পর আসনে, তার পর শরীরে, তার পর

মনে। এই চতুর্বিধ সংযম অবলম্বন করিলে মনের স্থিরতা পরিপক্কাবস্থা ধারণ করে। প্রথম তিনটি ভৌতিক, সর্ব্বশেষ আধ্যাত্মিক। ইহারা স্থৈর্য্যের পক্ষে সহায় ও হেতু। সুতরাং এ সম্বন্ধে অবহেলা করিও না। তিনটি এক শ্রেণীর, চতুর্থটি অন্য শ্রেণীর। কিন্তু সহায়তাসম্বন্ধে দুইই সাধকের পক্ষে প্রয়োজন ও অনুকূল।

১ম, স্থান।—সাধকের জন্য যে স্থান স্থির করা হয়, যত দূর সম্ভব সেই স্থানই অবলম্বনীয়। কতক গুলি বিষয় এমন আছে যাহার স্খলনে পবিত্রতার ব্যাঘাত হয় না কিন্তু সাধনের ব্যাঘাত হয়। স্থানসম্বন্ধে এই জন্য বলা যাইতে পারে, প্রাতঃকালে এক স্থানে, সায়ংকালে অন্য স্থানে, পর দিন অপর স্থানে পূজা করিলে, এইরূপ একই ঘরে, ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পূজা করিলে, উহা পরিত্যাজ্য। যে ঘরে উপাসনা করিবে সে ঘর এবং সেই ঘরের যে স্থানে পূজা করিয়া থাক সেই স্থান ও সেই দিক্ স্থির রাখিয়া প্রতি দিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপাসনা করা বিধেয়। যে দিকে মুখ করিয়া যে বিভাগে বসা হইল, উহা স্থির রাখিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিবে। ঘটনাক্রমে একান্ত বাধ্য হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পার, নচেৎ নয়। ফলতঃ এক ঘর, এক স্থান, এক মুখে সাধন আবশ্যক। চিন্তা, নির্জ্জনসাধন, সঙ্গীত, সজন উপাসনা, সর্ব্বত্র এইরূপ স্থির রাখিতে হইবে। যদি ছাদের এক স্থান

মনোনীত করা হইয়া থাকে, সেই স্থানে সাধন আবশ্যক। এরূপ স্থির রাখিবার তাৎপর্য্য কি? স্থানে ধর্ম্মবদ্ধ নহে, ইহা ঠিক্ কথা; কিন্তু স্থানসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। কেন না এক স্থানে শান্ত হইয়া না বসিলে সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কখন উদ্যানে কখন নদীর কূলে, কখন পর্ব্বতের উপরে ইত্যাদি। ইহাতে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু উচিত এই যে, যে স্থানে প্রথম বসিলাম, সেই স্থানে বসিয়াই সাধন করিব, কেন না ইহাতে প্রথমে ব্যাঘাত হইলে পরিশেষে তাহা জয় করিতে পারিব। এরূপ সাধনে মনঃসংযম, মনের উপরে কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন সুফল ফলিবে। যত পরিবর্ত্তন করিবে তার সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু স্থির রাখিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের দৃঢ়তা হয়।

২য়, আসন।—আসনসম্বন্ধেও এইরূপ। আজ এক প্রকার আসনে বসিলাম, কল্য আর এক প্রকার আসনে বসিলাম, আজ কিছুর উপরে বসিলাম, কল্য বসিবার কিছুই নাই, আজ অতি পরিপাটী বস্তুর উপরে উপবেশন করিলাম, কল্য অতি কদর্য্য আসনে বসিলাম—ইহা স্বেচ্ছাচার। স্থান জঞ্জালপূর্ণ অপরিষ্কার হইতে পারে, এজন্য আসনের ব্যবস্থা। তাদৃশ স্থানে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত হয় এজন্য আসনের প্রয়োজন। পূর্ব্বে যেরূপ অস্থিরতার কথা বলা হইয়াছে, আসনসম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কখন

মাটীতে, কখন প্রস্তরে, কখন বহুমূল্য আসনে, কখন সামান্য আসনে, কখন উচ্চ আসনে, এইরূপ নানা প্রকার আসনে মনকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া রাখাতে আসনসাধনের ব্যাঘাত হয়। কারণ আসনকে এইরূপ করিতে হইবে যেন উহা শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত। শরীরের সহিত উহা ভিন্ন নয়, সর্ব্বদা এই ভাবটী মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমি ছাড়া অপর বস্তু আছে, এরূপ মনে থাকিলে মনঃসংযমে ব্যাঘাত হয়। আসনের সঙ্গে ধনমর্য্যাদা, বা গরিবী, এ সকলের যোগ চিত্তবিক্ষেপের কারণ। ধনবানের আসনে বসিলে গর্ব্বিত ভাবে কথা আসিবেই। ধনবানের আসন, গরিবের আসন, এ সকল দূর করিয়া দিয়া চিত্ত স্থির করা উচিত। আপন আপন আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে মনের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইবে। আসন এত আপনার হওয়া চাই যে উহাতে ভাবান্তর বা চিত্তবিকার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

৩য়, শরীর।—উপবেশনসম্বন্ধে শরীরের স্থিরতা আবশ্যক। সাধন আরম্ভে এ নিয়মে বিশেষ আবদ্ধ থাকা উচিত। বারংবার হস্তচালনাদি, নানা প্রকার ভাবভঙ্গী, চক্ষুরুন্মীলন, নিমীলন, দিক্ পরিবর্ত্তন অনেকে সামান্য মনে করেন, কিন্তু স্থৈর্য্যসাধনে এ সকল একান্ত পরিহার্য্য। আত্মসংযম শরীরসংযমের সঙ্গে সম্বদ্ধ। শরীর স্থির হইলে মহৎ বিষয়েও মন স্থির হয়। ক্ষুদ্রে মন স্থির না

হইলে মহদ্বিষয়ে মন স্থির হয় না। শরীর এ রূপে রাখার বিধি নাই যাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ রোগ বা ক্লেশ হয়। আসনের উপরে এমনভাবে উপবেশন করিতে হইবে, এত টুকু আরামে থাকিবে যে সাধনে ব্যাঘাত না হয়। শরীর লইয়া ক্রীড়া করা—যেমন উঠা বসা, শরীরের ভাবভঙ্গী পরিবর্ত্তন করা, ইহাতে মন স্থির হয় না। বাহ্যে স্থিরতা হইলে সর্ব্ববিষয়ে স্থিরতা হয়। পাঁচ মিনিট সাধন করিতে হইলেও এই নিয়ম অনুসরণ কর্ত্তব্য। আরাধনা ধ্যান সকলই এই ভাবে সাধন করিতে হইবে। একটি সাধন যত ক্ষণ শেষ না হয়, সেই ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে। এক বার হাত পা নাড়িলে পরিত্রাণ হয় না তাহা নহে, কিন্তু শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষার জন্য ইহা আবশ্যক।

এই ত্রিবিধ স্থিরতা দিন দিন মনের স্থিরতা পক্ষে সহায় হইবে। ইন্দ্রিয়সংযমে বাহ্যিক ব্যাঘাত, ব্যাঘাত নহে, কিন্তু ইহাতে শরীর মনের স্থৈর্য্য উপস্থিত হয়। ত্রিবিধ স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলে গূঢ় ভাবে মনের স্থিরতা হয়।

৪র্থ, মনের স্থিরতা।—বিরুদ্ধ চিন্তা "দূর হ" বলিয়া দূর করিতে হইবে, ইহাই সে রোগের প্রতীকার। চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় এজন্য শম, দম, নিয়ম অভ্যাস করা উচিত। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা, এইরূপ করিয়া

চিন্তা অভ্যাস করিবে। কোন পুস্তক পড়িতে ভাল লাগে না, অন্ততঃ এক কোয়াটর তাহাতে বদ্ধ রাখিতে হইবে। মন যদি অন্য সময়ে স্বেচ্ছাচারী হয়, উপাসনার সময় তাহার বিষময় ফল দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকচিন্তা, ভক্তি, বিনয়, জীবনের কার্য্য, পরিবারের হিত, কিয়ৎকাল স্থির মনে অনুসরণ করিবে। চিত্তসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার, কার্য্যে কথায় ভাবে যত দূর সম্ভব পরিত্যাজ্য, মনকে এ সকল বিষয়ে শাসন করা উচিত। গানসম্বন্ধেও স্বেচ্ছাচার হইয়া থাকে। যদি এরূপ গানে উপকার হয় তথাপি ত্যাজ্য। মনের উপর এমন জয় লাভ করা উচিত যে, একই গানে সাত বৎসর ভাবের উদয় হইবে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাধক বলিয়া এরূপ হয় না। যদি বল এরূপ স্বেচ্ছার অনুসরণ করিলে ফল হয়, ইহার প্রমাণ আছে। কেহ একথা অস্বীকার করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ফলাফলবাদী সাধকের পক্ষে এ কথা খাটে, উচ্চ শ্রেণীর সাধকের পক্ষে এ কথা খাটে না। আপাততঃ ফল পাইলাম, উচ্চ হইলাম, আশু হিত লাভ হইল, এ কথা যাহারা বলে, তাহারা উপাসনার প্রতি মর্য্যাদা করে না, পরিবর্ত্তনের মর্য্যাদা করে। স্বেচ্ছাচারনিবারক স্থৈর্য্যতত্ত্ব, তাহাতে ইহার বিপরীত বিধি। উপকার হইলেও পরিবর্ত্তন পরিহার্য্য। এ স্থলে মনে রাখা উচিত যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল পুস্তক, সকল শ্লোক উপযোগী হয় না, সেখানে আত্মার উন্নতির জন্য

ভত্তভাবের গ্রন্থাদি অবলম্বন আবশ্যক ; কিন্তু ইহাতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। পরিবর্ত্তন যত্ত দূর আবশ্যক তত দূর করিতে হইবে, ভাল লাগে না বলিয়া পরিবর্ত্তন দূষণীয়। যত্নে স্বেচ্ছাচারকে আয়ত্ত করা উচিত। চিন্তা, সাধনপ্রণালী, পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তন, ভাবোদয় সম্বন্ধে যখন যাহা ভাল লাগে তাহা অনুসরণ করিলাম, ইহা পরিহার্য্য। আরাধনা, ধ্যান, প্রণাম, একই প্রণালীতে করিতে হইবে। সাধনের অঙ্গে যে সকল শ্লোক পাঠ করিবে তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা এবং শ্লোক, সেই সেই বিভাগে অপরি-বর্ত্তনীয়। এক কথা উচ্চারণে প্রেম হইবে। সেই শব্দ চিন্তার মূলে থাকিলে ভাবোদয় হইবে।

যে চারিটি বিষয় বলা হইল সেই সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া একতা, স্থিরত্ব, সমতা অবলম্বন আবশ্যক। আসন ও স্থান মন ভাবিবে না, শরীর মনের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে। এক প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই, এক দিন এক জন যে পর্য্যন্ত চলিয়া গেল সেই স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিলে তিনি উচ্চতর স্থানে যাইতে পারেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিলে কখন সেরূপ হয় না। এক পথ হইলে কত দূর অগ্রসর হওয়া গেল বুঝিতে পারা যায়। এমনি এক বিষয়ের সাধন করিলে সাধনের গভীরতা হইতেছে কি না বুঝিতে পারা যায়। যেমন এক

"সত্যং" সাধন করিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত সেই সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলে উন্নতি বুঝিতে পারা যায়, অন্যথা উন্নতি পরিমাপক যন্ত্রের অভাব হয়। এক সময়ে নানা সাধনে গেলে উন্নতি জানা যায় না। সুতরাং বলিতেছি এক প্রণালীতে চেষ্টা করিলে প্রচুর ফল লাভ হয়। এরূপে চারিটিকে একটি করিয়া ঈশ্বর স্থির আত্মাকে গম্যস্থানে লইয়া যান।

আত্মসংযম ব্যায়ামের ন্যায়। ব্যায়ামে যেমন বলবৃদ্ধি হয়, অভ্যাসে তেমনি বলবৃদ্ধি হয়। যদি সামান্য সামান্য কার্য্যেও দৃঢ়তা অবলম্বন করি তাহাতে অবিধি নাই। এক পুস্তক, এক চিন্তা, এক পথ, এক লেখা, এমন কি সূচে সুত্র দেওয়া প্রশংসনীয় প্রণালী। স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিবার জন্য কার্য্যে পর্য্যন্ত নিয়ম করিতে হইবে। অমুক বিষয় ভাল লাগিল না বলিয়া ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া স্বেচ্ছাচার, সাধনের পথে এরূপ স্বেচ্ছাচার থাকিতে দেওয়া অন্যায়। ভাল লাগুক আর না লাগুক কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে অবলম্বন করিতেই হইবে।

সমতা সাধন।

মনের স্থিরতা সম্পাদন জন্য আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। সমাহিত মন হওয়া সমচিত্ত হওয়া প্রয়োজন।

একইরূপ মন থাকিবে, শরীর একাবস্থায় থাকিবে এরূপ সাধন চাই। মনকে স্থির করা বড় কঠিন। অবস্থাভেদে মনের ভিন্নতা হয়, সাধনভেদে মনের অবস্থা ভিন্ন হয়। সংসারে ধর্ম্মপথে মনের অবস্থা ভিন্ন। সৎকার্য্যে উপাসনা প্রার্থনাদিতে মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে। সমাহিত মন সমচিত্ত পরম সম্পত্তি, উহা অর্জ্জন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মের অবস্থা অত্যন্ত শান্ত এবং সর্ব্বদা সমান। উপাসকের সেই আদর্শ রাখিতে হইবে। অবস্থাবিশেষ মনকে কখন চঞ্চল করিতে না পারে এজন্য যত্ন করিতে হইবে। অবস্থাকে জয় করিয়া স্থির হইতে হইবে। সুখে উল্লাস, দুঃখে অধীর হইবে না। আপাততঃ সাধনের প্রথমে তৎসম্বন্ধে আতিশয্য পরিত্যাজ্য। সংসারের কাজে, স্তুতি, নিন্দা, প্রশংসা, অপ্রশংসা, সম্পদ, বিপদ সকলেতেই প্রসন্ন থাকিতে হইবে, কখন অবসন্ন হইবে না। সর্ব্বদা সমভাব অবলম্বন করিয়া দুইয়ের মধ্যস্থলে থাকা উচিত। সমচিত্ত না হইলে, না উপাসনা হয়, না সংসার হয়।

উপাসনায় সর্ব্বদা এক প্রণালী থাকিবে। যে ব্যক্তির তৎসম্বন্ধে স্থিরতা নাই, সে সময়ে সময়ে উপাসনায় উন্মত্ত, সময়ে সময়ে শুষ্কহৃদয় হয়। এরূপ এক সময়ে উন্মত্ততা এক সময়ে শুষ্কতা নিজ ইচ্ছায় স্বেচ্ছাচারিতায় হয়। যে

ব্যক্তি এক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহার সাধন ও ভক্তি এক অবস্থায় থাকিবে, কোন প্রতিকূল কারণে বিনষ্ট হইবে না। একটি পথ ধরিয়া তাহা ছাড়া নিষিদ্ধ, এ সম্বন্ধে নিয়ম থাকিবে। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ নিয়ম হইতে পারে, ইহাতে প্রণালীর দৃঢ়তা বিনষ্ট হয় না। দৃঢ় প্রণালীতে আরাধনা, স্তব, প্রার্থনা, ধ্যান, সঙ্গীতাদি করিলে সমতা হয়। তিনি সৌভাগ্যবান্ যিনি বিশেষ দিনে বিশেষ এবং প্রতিদিন সমান সুখ প্রাপ্ত হন।

সাধক সর্ব্বদা মনকে আয়ত্তে রাখিবেন। অশ্ব যদি সমান গতিতে যায়, তবে অধিক দূরে যাইতে পারে। সাধন দ্বারা মন অশ্বকে এক গতিতে রাখা উচিত। সাধন-রজ্জু দ্বারা মনকে সংযত করিলে উহা একই ভাবে থাকে। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে ভিন্নতা হইবে কিন্তু দৈনিক সাধনকে প্রমত্ত অবস্থাতে রাখা চাই। দর্শন, প্রেম, আশা, বিশ্বাস, উল্লাস, মগ্নভাব প্রতিদিন স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। সমচিত্ত হইয়া থাকিলে বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি সমস্ত সমাবস্থায় থাকে। প্রকৃত সাধন থাকিলে এইরূপ হয়।

স্বেচ্ছাচারী হইয়া এক দিন অনেক গান করিলে, আলোচনা করিলে, সাধন করিলে, আর এক দিন অবসন্ন হইয়া পড়িলে, ইহা চেষ্টা দ্বারা পরিহার্য্য। প্রতিদিন ভাবের সহিত একটি বা দুইটি সঙ্গীত যথেষ্ট। অন্যান্য বিষয়

সম্বন্ধেও এইরূপ। যিনি ঈদৃশ উপায়ে সাম্যাবস্থা লাভ করেন, তিনি সিদ্ধমনোরথ হন।

সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া অনেক গান অনেক পুস্তক পাঠ ইত্যাদি অবলম্বন করিলে ক্রমে উহা শক্তি-হীন হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম হইতে আতিশয্য দোষ পরিহার করা উচিত। দুই পাঁচ দিন সংযমের সময়ের মধ্যে দেখিতে হইবে, উপাসনার গতি এক প্রকার নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছে কি না? স্থায়ী ভাব অধিকৃত রহিয়াছে কি না? সজনে নির্জ্জনে গাম্ভীর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না? যাহা কিছু হইয়াছে তাহা স্বভাবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে কি না? ফলতঃ যত দিন মন স্থির থাকিবে, তত দিন সব সমান থাকিবে। সুতরাং সাধন দ্বারা সমুদায় স্থির করিয়া লইতে হইবে।

২য় উপায়।—জীবন কখন শীতল হয়, কখন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়, কখন সংসারের শীতল বায়ু লাগিয়া মৃতপ্রায় হয়। জীবনে কেবলই হ্রাস বৃদ্ধি। এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে উত্তাপ এবং শৈত্য স্বাভাবিক হয়। বিধি এই;—ঈশ্বরের নামসংক্রান্ত কোন প্রকারের বাক্য উচ্চারণ বা হৃদয়ে আলোচনা করিবে। উচ্চ নীচ ভাব নিবারণের জন্য এটি বিশেষ উপায়। কারণ নামের মধ্যে উত্তাপ আছে। দিনের মধ্যে পাঁচ বার বা দশ বার মনে মনে বাক্য উচ্চারণ করিলে হৃদয়ে গভীর ভাব উপস্থিত

হয়। যেমন "সদ্‌গুরু ভরসা।" 'দয়াময় সহায়" "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" "ঈশ্বর ভরসা।" ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন প্রকার শব্দ মনে আলোচনা করিলে সেই শব্দের মধ্যে এমন উত্তাপের সামগ্রী আছে, যাহাতে শীতলতা বারণ হয়। নামসংস্পর্শে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। জীবনপথে উত্তাপের সামগ্রী সহ সংস্পর্শ হওয়া উচিত। কার্য্যের মধ্যেও ইহা সম্ভব। ভিতরে প্রাণের মধ্যে যেখানে বসিয়া আছি, সেখানে এইরূপ দু একটি শব্দ মধ্যে মধ্যে উচ্চারিত হইলে মন স্থির থাকে এবং ভিতরে গভীর ভাব রক্ষা পায়। ইহাতে মনের সমভাব হয়, একবারে শীতল হইতে দেয় না। ইহাতে আমোদের মধ্যেও গাম্ভীর্য্য আনয়ন করে। সুতরাং এইরূপে মনকে সমাহিত এবং সংযত করা উচিত।

যে বিধির উল্লেখ হইল, অনেক সাধক ইহাকে উপকারের হেতু বলিয়া জানিয়াছেন। উপাসনান্তে যে মনটুকু ফাঁক থাকে, তাহাতে মন অন্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। তন্নিবারণ জন্য মনকে উত্তপ্ত করিবার জন্য ঐগুলিকে মন্ত্ররূপ করিয়া লইবে।

৩। নির্জ্জনসাধন।—নির্জ্জনসাধনসম্বন্ধে নিয়ম রাখা উচিত। নির্জ্জন ভাল না লাগিলে সজনে যাওয়া, সজন ভাল না লাগিলে নির্জ্জনে যাওয়া, ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতা হয়, সৎসঙ্গের প্রতি বিরক্তি উপস্থিত হয়। নির্জ্জনে এক-

প্রকার সর্জনে অন্য প্রকার ভাব স্থির রাখা উচিত। যে অবস্থায় হউক না কেন মন সাম্যাবস্থায় থাকিবে ইহা আবশ্যক। নির্জ্জন সজন, ধ্যান আরাধনা, দিবা রাত্রি, সম্পদ বিপদ্, একাকী বা সকলের সঙ্গে, সমুদায় অবস্থাতে একটি ভাব স্থির থাকিবে এইরূপ সাধন আবশ্যক।

স্থান, আসন, শরীর ও মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মনকে এক দিকে আনয়ন কর। যে সকল উপকরণ ছাড়িয়া দিতে হয় ছাড়িয়া দাও। সকল বিষয়ে আতিশয্য পরিত্যাগ কর। স্থির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সাধন করিতে থাক। যে প্রণালী ধরিবে, সেই প্রণালী স্থির রাখিতে হইবে। অবস্থার দাস হইলে চলিবে না। উৎসাহ সহকারে সংযত মনে উপাসনা করিবে। মনের স্থিরতা সমস্ত দিন রাখা সহজ নহে। মন এরূপ সমাহিত হওয় কঠিন। এজন্য যাহাতে মন সমস্ত দিন সমাহিত থাবে এজন্য যত্ন আবশ্যক। পূর্ব্ব জীবনের ঘটনার দ্বারা সমস্ত স্থির করিয়া রাখা উচিত। জীবন এক প্রকার চলে এজন নিয়ম অবলম্বনীয়। আহার ব্যবহার বস্ত্র এ সকল এঃ প্রকার অবস্থায় যাহাতে থাকে তাহা করা প্রয়োজন। সকলে স্থিরতা না হইলে ধর্ম্মসাধনে অনুকূল অবস্থা ঘে না। অবস্থাকে জয় করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে সাধ করিবে।

চিত্তের স্থিরতা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে

১ম. অন্য প্রকারের চিন্তা বিদায় করিয়া দেওয়া; ২য় ইন্দ্রিয়াদিদমনে শান্ত ভাব এবং দান্ত ভাব। অন্য চিন্তা বিদায় করিয়া দিয়া এক চিন্তাতে মন নিয়োগ করা যেমন কর্ত্তব্য, প্রবল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রতিবিধান করাও তেমনি কর্ত্তব্য। কামক্রোধাদি রিপু প্রলোভনে উত্তেজিত হয়, প্রলোভন বিনা নিদ্রিত থাকে, প্রলোভনে জাগ্রৎ হয়। বারংবার উত্তেজিত হইয়া পরিশেষে এমনি হয় যে প্রলোভন উপস্থিত না হইলেও চিত্ত দ্বারা কল্পনা দ্বারা উহারা উত্তেজিত হয়। দুর্ব্বলদিগের প্রতি বিধি—প্রলোভনের নিকট না যাওয়া। প্রলোভন নিকটে রাখিয়া সাধন মহাবীরের কার্য্য। মন দুর্ব্বল জানিলে জ্ঞাতসারে উত্তেজনার নিকট যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, জয়লাভের আশা দুরাশা মাত্র। এ কথার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিবে না। জীবন প্রলোভন হইতে দূরে রাখা উচিত।

বাহ্যিক কারণে রিপুর উত্তেজনা হয়। উহা সমুদায়ে দুই শ্রেণী। ১ম নিজের পরিবার, চলিত ভাষায় সংসার। স্ত্রী পুত্র সাংসারিক ভাব উত্তেজিত করে এবং সেই কারণে মন অস্থির হয়। ২য় অন্যান্য লোক, জগৎ, সাধারণ জনসমাজ। একটি গৃহসম্বন্ধীয় অপরটি সাধারণ, একটি পারিবারিক অপরটি সামাজিক। এই দ্বিবিধ কারণে মন প্রলুব্ধ হয়। যাহার সংসার নাই তাহার তৎসম্বন্ধে বিরক্ত হইবার কারণ নাই, যাহার সংসার আছে তাহার বিরক্ত হইবার

কারণ আছে। এই কারণ হইতে দূরে থাকা সমুচিত। জন-সমাজের সঙ্গে অল্প সংস্রব রাখিয়া প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এই দুই প্রকারের উত্তেজনা জানিয়া শুনিয়া রাখিবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিবারের ভিতরে থাকা, জন-সমাজের মধ্যে থাকা। কিন্তু যেখানে নিশ্চিত মরণ সম্মুখে, সেখানে সাধনের জন্য সাবধান হইতে হইবে। যে যে কার্য্যে যোগভঙ্গ, ধ্যানভঙ্গ, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য হয় যত দূর সম্ভব যত দূর সঙ্গত তাহা হইতে দূরে থাকা উচিত। পারীবারিক চিন্তায় মন চঞ্চল করে। যাঁহারা ব্রতপরায়ণ হইবেন, তাঁহাদিগের তৎপূর্ব্বে সংসারের এমন একটি বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন যে তজ্জন্য মন অস্থির হইয়া সাধন বন্ধ না হয়। যে যে কারণে মন অস্থির হয় বন্ধ করিতে হইবে। বিশেষ আয়োজন বিশেষ প্রতিবিধান না করিলে যোগ ভঙ্গ হইবে। নিশ্চিন্ত যত দূর হইতে পারা যায় হওয়া উচিত। যাঁহারা একটি বিষয় সাধন করেন, তাঁহাদের অন্ততঃ তৎকালের জন্য সমুদায় স্থির করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তোমাদের সংসারের এমন একটি বন্দোবস্ত চাই যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করিতে পার, চিন্তার দ্বার খুলিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে না। কিছু দিনের জন্য স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতে হইলে যাহারা অন্নবস্ত্রসম্বন্ধে অধীন তাহাদিগের গতি করিয়া যাইতে হইবে। কিছু দিনের জন্য বিদেশ যাইতে হইলে লোকে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যায় তোমাদের সেইরূপ

অবস্থা। বিদেশ যাওয়ার ন্যায় সাধনের দেশে যাইবে, সেখানে থাকিয়া এখানকার সংবাদ লইতে পারিবে না। সমুদায় বিষয়ে এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা উচিত যে যাত্রার সময়ে সাক্ষী করিয়া বলিতে পার, নিশ্চিন্ত হইবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করা হইল। জানিয়া শুনিয়া যেন কোন কণ্টক না রাখা হয়। প্রত্যেক সাধকের প্রতি এই অনুজ্ঞা। নির্ব্বিঘ্ন সাধনে অবিলম্বে অনেক উন্নতি। বিঘ্নবাধাস্থলে উপাসনা সাধন করিবে। অক্ষমতা সত্ত্বে অগ্নিপ্রজ্বলিত করা কষ্ট পাওয়া। সাধন আরম্ভের পূর্ব্বে এমন নিশ্চিতরূপে সংসার ও পরীবারসম্বন্ধে সুশৃঙ্খল করা উচিত যে সাধনে বিঘ্ন জন্মিতে না পারে। অবশ্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা গণনীয় নহে। ফলতঃ এমন করিয়া যাইবে যাহাতে চিন্তার ডোর ছিন্ন হয়। নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির কারণ ছেদন করিয়া যাইবে। যে দিনের জন্য যাইবে সেই দিন কাটিয়া যাইতে পারিলে নির্ব্বিঘ্ন। নির্ব্বিঘ্ন না করিলে বিঘ্ন কলঙ্ক কল্পিত ধর্ম্ম বা সংসারে পতন সম্ভাবনা। সামাজিক বিঘ্নের বিষয় পরে বলা যাইবে।

১। যে যে কারণে সংসারে অবিশুদ্ধ চিন্তা, যোগভঙ্গ, ধ্যান তপস্যার বিঘ্ন আইসে, সে সকল নিরাকরণ করিয়া নিশ্চন্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে।

২। পরীবারদিগের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবে। যাহাতে

প্রাণনাশ না হয় তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা গুরু কর্ত্তব্য। ঔষধ, অন্ন, বস্ত্র এ সকলের জন্য চিরদায়ী। এসম্বন্ধের অপরাধের মোচন নাই।

রিপুবলাবল নির্ণয়।

বিপদকে লঘু মনে করা উচিত নয়। গুরু বিপদ জানিলে জয় করা সহজ হয়, সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয় দমন না হইলে যোগের ব্যাঘাত হয়, ভক্তির ব্যাঘাত হয়। সমাহিতচিত্ত এবং দান্ত হওয়া সকলশাস্ত্রসম্মত। শান্ত সমাহিত না হইলে কখন শান্তি হয় না। ইন্দ্রিয় জয় করা সহজ মনে করিয়া বিপদকে লঘু মনে করা উচিত নয়। সত্যকে সাক্ষী করিয়া যাহা ঠিক যেমন, তাহাকে ঠিক সেই প্রকারে দেখা উচিত। ইন্দ্রিয়দমন সহজ কঠিন দুইই। যে সকল ইন্দ্রিয় প্রবল নয় সে সকলকে সহজে দমন করা স্বভাবসঙ্গত। অভ্যাস, স্বভাব, রীতি, অবস্থা, শিক্ষা, রুচি এই গুলি কোন কোন রিপুদমনসম্বন্ধে অনুকূল হয়। যেখানে এরূপ অনুকূলতা আছে সেখানে দমন সহজ এবং সম্ভব। যাহার হৃদয় কোমল, ক্ষমাশীল, দয়ার্দ্র, পরোপকারে ইচ্ছুক তাহার রাগ করা সম্ভব নয়। যদি রাগ হয় শীঘ্র রাগ বিদায় করা সম্ভব। যাহার সংসারে বিলাস নাই, দীনভাব অভ্যাস দ্বারা সুখাসক্তি কম হই-

য়াছে, তাহাতে লোভের আতিশয্য সম্ভবে না। এইরূপ কামাদি সমুদায় রিপুর জয় স্থলবিশেষে অবস্থাবিশেষে লোকবিশেষে সহজ। যে হৃদয়ে যে ব্যক্তিতে শিক্ষা রুচি অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বদ্ধমূল হইয়াছে, সে হৃদয়ে সে ব্যক্তিতে ইন্দ্রিজয় কঠিন, অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব। সুতরাং যে বিপদ যত বড়, কম করা নয়, বৃদ্ধি করা নয়, অত্যুক্তিতে গ্রহণ করা নয়, স্বরূপতঃ গ্রহণ করা উচিত। ইন্দ্রিয় এবং আসক্তির বিষয় গুলিকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে হইবে। দশটি আসক্তিকে জয় করিতে পার, একটি হয়তো চিরজীবন অপরাজিত থাকিবে। একটিকে হয়তো বৃদ্ধ কালে জয় করিতে পার, যৌবনে নহে, এক অবস্থায় পার, অন্য অবস্থায় নহে। স্বভাব ও অভ্যাস দ্বারা আসক্তি প্রবল হয়। মুক্ত হওয়া—স্বভাবকে অভ্যাসকে জয় করা দমন করা। আসক্তি দমন সহজ নয়। উত্তেজনায় যোগ-ভঙ্গ করিবে না, কামাদি রিপু প্রবল হইয়া উপাসনার ব্যাঘাত করিবে না, এরূপ দমন করিতে চেষ্টা করা উচিত। এক জনের চল্লিশ বা সত্তর বৎসরের পরও পতনের সম্ভাবনা। রিপুগণের বাহ্যিক অত্যাচার দমন সম্ভব, কিন্তু হৃদয় হইতে দূর করা সহজ নহে। বাহ্যে নিয়মিত, হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রিপুদ্বারা পতনের সম্ভাবনা। রিপু সংযত হইলেও পুনরায় দেখা দিয়া থাকে। অনেক বয়স জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাটাইলেও প্রলোভনে পড়িয়া পতন

সম্ভব। রাগ—ধর্ম্মরাজ্যেও রাগের অনেক কারণ আছে। এখানে কামরিপুর উত্তেজক অপেক্ষায় ক্রোধ রিপুর উত্তেজক বেশি। বাহ্যিক কার্য্যে না থাকিলেও মনে ক্রোধ আইসে। কথা বলা সংযত করিলে, তথাপি সংযত ক্রোধের নারকীয় উত্তাপ মনে অনুভূত হইবে। কার্য্যে অত্যাচার করিলে না, কিন্তু মনে করা হইল। প্রেমসাধন দ্বারা রাগ নির্জ্জিত হইলেও আবার পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। এক জন বৈরাগী হইলেও রাগী হইতে দেখা যায়। ভিক্ষা করিতে আসিয়া ভিক্ষা না পাইলে রাগিয়া যায়। স্বার্থপরতা ও আপনার বলে ও জ্ঞানে আমিত্বদর্শন—ধর্ম্মবিধিপরায়ণতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা রোধ করিলেও—টানিবে। প্রেম হইলেও উহারা ফিরিয়া আইসে। অহ-ঙ্কার প্রায় ছাড়ে না, ভিন্ন ভিন্ন আকারে সঙ্গে থাকে। অহ-ঙ্কার অভিমান খর্ব্ব করিলেও বিনয়ী শান্ত হইলেও আবার আইসে। কার মনে কোন রিপু প্রবল তিনি জানেন, এবিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন নাই। সত্যের প্রদীপ লইয়া লজ্জা না করিয়া রিপুর মুখে ধরিবে, চির জীবন বিশ্বাস করিয়া থাকিবে এইটি প্রবল। কাম, ক্রোধ, হিংসা, নির্দ্দয়তা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির যিটি অত্যন্ত প্রবল তৎসম্বন্ধে এইরূপ জানিতে হইবে, বরং জীবন যাইতে পারে, এ পাপ নাও যাইতে পারে। অত্যন্ত সাধন ভজনে রিপুর মাথা হেট হইয়া থাকে একেবারে সংহার কঠিন। অসম্ভব জানিলে

প্রায় নিরাশা হয়। নিরাশ হয় বলিয়া সত্যকে অসত্য বলিতে পার না। আমি আছি যেমন সত্য, আমার রিপু আছে তেমনি সত্য। যে রিপুতে মনকে বিক্ষিপ্ত করে স্থির হইতে দেয় না, যাহাকে এ জীবনে দূর করা সম্ভব নয়, সে রিপুসম্বন্ধে এমন কঠিন সাধন করিবে যে সে মাথা তুলিতে না পারে। যাহা সহজে মনকে ধ্যানচ্যুত করিতে পারে, মলিন করিতে পারে, দশ দিনের অর্জ্জিত বল আদ ঘণ্টার মধ্যে টানিয়া লইতে পারে, সে রিপু অপেক্ষা প্রবল সাধনের প্রয়োজন। রিপুকে কখন বন্ধু বলিও না, যে রিপু যেমন সে রিপু চির দিন তেমনই। সর্ব্বদা রিপু অপেক্ষা প্রবল সাধন গ্রহণ করিবে। এমন সাধন অবলম্বন করিবে যাহা অব্যর্থসন্ধান। সেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়া উহাকে বিনাশ করিবে। যেমন রিপু প্রবল তেমনি সাধন প্রবল চাই। জয় করিবই করিব এই বিশ্বাস থাকিলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ হইবে। কোন্ রিপু প্রবল, আত্মানুসন্ধান দ্বারা জান। অনেক যোগী অনেক ভক্তের ইন্দ্রিয়গত দোষ ছিল জানিয়া, ক্ষুদ্র জানিয়াও এমন সাধন লইবে যাহা রিপু অপেক্ষা প্রবল। রিপুজয় হইবে এই বিশ্বাসে সাধনের পথে প্রবৃত্ত হইবে। সাধনপ্রভাবে রিপু বিষদন্তভগ্ন সর্পের ন্যায় থাকিবে, কখন বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না।

মনকে স্থির করিবার সাধনসম্বন্ধে দুই প্রকার বিষয়ের

উল্লেখ হইয়াছে, ১ ম স্ত্রী পরিবার, ২ য় সাধারণ বা সামাজিক। পরিবার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতে দায়িত্ব। তৎসম্বন্ধে চিন্তা যোগভক্তির পক্ষে বিঘ্ন জন্মায়। সংসারের বন্দোবস্ত করিয়া যোগভক্তির পথে যাওয়া উচিত, কেন না বন্দোবস্ত করিয়া গেলে কোন প্রকার উদ্বেগ অস্থিরতা উপস্থিত হইবে না। লোকে কোন তীর্থে যাইবার সময় যেমন পরিবারের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তীর্থে গমন করে এখানে তদ্রূপ। সাধক বিবাহ করিলে, স্ত্রী পুত্রের ভার থাকিলে, তজ্জন্য চির দিন ঈশ্বরের নিকট দায়ী। সেই ঈশ্বর আবার ধর্ম্মসাধনের জন্য নিয়োগ করিলে উভয়বিধ কর্ত্তব্যপালন সাধনের পূর্ব্বে প্রয়োজন। যিনি আপনি দুই বিধি দেন তিনিই শরণাগত সাধককে উভয় দিক রক্ষার যোগাড় করিয়া দিতে পারেন।

জনসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা উচিত। গিরিগহ্বরে দূরস্থ অরণ্যে লুক্কায়িত হইয়া দিন যাপন করিতে হইবে এরূপ নহে। মনুষ্যসমাজে থাকিতে গেলে সময়ে সময়ে নিজ ধর্ম্ম এবং অন্য ধর্ম্মের বিষয়ের সঙ্গে মিলিত হইবে, কার্য্যের অনুরোধে লোকসমাজে যাওয়া উচিত হইবে, নৌকা এবং গাড়ী ইত্যাদিতে অন্য লোকের সঙ্গে একত্র হইতে হইবে। এই তো গেল প্রথম। দ্বিতীয়—কর্ত্তব্যানুরোধে। দেশের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান উচিত। সেই সকল কার্য্য করিতে গেলে নিজ ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়া

যেমন উচিত, তেমনি অপর ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়া আবশ্যক। এখানে অমুক সাধু অমুক অসাধু ইহা বলিয়া বিচ্ছিন্ন থাকিবার উপায় নাই। কেন না কখন ঈশ্বরের কি আদেশ হইবে কে জানে? জনসমাজে উভয় সংসর্গ অনিবার্য্য। যদি বল সাধনে সাধুসঙ্গেরই প্রয়োজন অসাধু সংসর্গে প্রয়োজন নাই, একথা বলিতে পার না কেন না যদি ঈশ্বর আদেশ করেন অসাধুর নিকটও গমন করিতে হইবে। তোমার ইচ্ছামত সংসারে অবস্থিতি হইবে এরূপ বলিতে পার না। যোগী বলিয়া তুমি পাপী বিষয়ী ইত্যাদির সঙ্গে থাকিবে না, এরূপ মনে করা উচিত নয়। অবস্থা অনুকূল ঘটনা বশতঃ হইবে।

পরীবারের সম্বন্ধে যেমন তেমনি জনসমাজের সকলের সঙ্গে নিয়ম করা উচিত। কি কি কাজ করিতে হইবে অগ্রে স্থির রাখিতে হইবে। বিষয়ীর সঙ্গে দেখা হইলে মন যদি অস্থির হয় সাধন হইবে না। কিরূপে কথা বলিলে উপাসনার ব্যাঘাত হয় না স্থির করা উচিত। ধ্যানের পর হয় তো এক জন অধার্ম্মিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে। অগ্রে কথা ও ব্যবহার স্থির না থাকিলে মনের ভাল ভাব বিনষ্ট হইতে পারে। বিষয় কার্য্য করিতে হইলে বিষয়ীরা ধর্ম্মের প্রতি অবমাননাসূচক কথা বলিতে পারে, রাগ ও অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে। কত ঘণ্টা পরিশ্রম করা উচিত জানা আবশ্যক। পরিশ্রম করিব না,

পার্থিব কার্য্য করিব না, এ অসম্ভব আশা। মন স্থির করিয়া নিয়মে বান্ধা উচিত। উপাসনা যোগ ভক্তি এ সকলের নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। যেখানে গেলে মন বিচলিত হইবে সেখানে না যাওয়া ভাল। যদি যাইতে হয়, এই ভাবে যাইতে হইবে, এই ভাবে কথা বলিতে হইবে, অগ্রে স্থির রাখা উচিত। যে অবস্থায় মন ক্রমান্বয়ে বিক্ষিপ্ত হয়, ধ্যান চিন্তায় মন সংগ্রহ করিতে কষ্ট হয়, সে অবস্থায় তাহা হইতে দূরে থাকা শ্রেয়ঃ। দুমাস ছমাস ছাড়িয়া যাওয়া আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কর্ত্তব্য বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ সাধনের জন্য পাহাড়ে নির্জ্জনে গিয়া মন ভাল করা উচিত। আত্মার বিনাশ হইবে জানিয়া সমাজে থাকিতে হইবে না। মন বিক্ষিপ্ত, উহার কোমলতা যাইবে, এ অবস্থায় থাকিবে না। যাহার শক্তি নাই, তাহার নির্জ্জনে যাওয়া উচিত। একেবারে চিরকাল নির্জ্জনে থাকিব ইহা দুরাশা, অবৈধ সঙ্কল্প, ঈশ্বরের বিধিসঙ্গত নয়। এ অভিলাষ ঈশ্বর পূর্ণ করেন না। চেষ্টা দ্বারা করিলেও ইহা হয় না। অবিষয়ীর সঙ্গে থাকিলেও বিষয়ের আলাপ হইবে; সেই আলোচনায় অস্থিরতা থাকিবে। ঘরের ভিতরেও ব্যাঘাত থাকিবে বাহিরেও থাকিবে। বিধি স্থির থাকিবে। পার্থিব কাজ এতটা করিব এইরূপে সংযত রাখিব। কথায় রাগ উদ্দীপন হইলে মুখ বন্ধ করিব, কি অন্য স্থানে চলিয়া যাইব। ধর্ম্মবিরোধস্থলে

মনকে এইরূপে প্রতিরোধ করিব বা চলিয়া যাইব। অন্যায় আমোদে সময় নষ্ট করিব না, মুখভঙ্গী দ্বারা অমত জানাইব। গতায়াতে নৌকাদিতে কোন লোকের সঙ্গে যোগ দিলেও মনকে এইরূপে সংযত রাখিব। এরূপ কর্ম্ম করিব না, এরূপ আমোদ করিব না। এই এই আমোদ সঙ্গত, এই এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে পারি, এই এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে পারি না। আলোচনা তর্কে বিতর্কে মন বিচলিত বা উত্তেজিত হইলে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দশ মিনিট একাকী মন স্থির করিব, পরে দূরে থাকিব। প্রথমে বিধি স্থির করিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। পরীবার ও সমাজ সকল সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলে ভয়শূন্য হইবে। বিঘ্ন সর্ব্বত্রই আছে ইহা জানিয়া চিরকালের জন্য পলায়ন করিতে যত্ন করিবে না। ইহাতে আর কিছু ফল নাই কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন।

যোগের গতি।

হে যোগশিক্ষার্থিন্, ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ কি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দুই পদার্থের সংযোগ; দুই পদার্থ বিভিন্ন, ক্রমে পরস্পরের নিকটস্থ হইয়া অবশেষে যোগ; সেই মিলনের অবস্থা যোগ। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে দুই বিষয়ে ভিন্নতা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকৃতি-

গত ক্ষুদ্রতা. ইহা কোন প্রকারে যাইবে না। অনন্তের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা অনিবার্য্য। পরিমিত ভাবে যাহা আছে তাহার বৃদ্ধি আছে, যেমন সদ্ভাবের বৃদ্ধি কিন্তু ক্ষুদ্রতার সীমা ক্ষুদ্রতা। দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাগত। ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিয়া আমরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হই, জ্ঞানে, ভাবে, কার্য্যে বিরোধী হই। বিরোধ বিনাশ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রমে জ্ঞানাদিতে মিলন যোগ।

তুমি ইহার পথ জিজ্ঞাসা করিতে পার। যোগের পথ কোন্ দিকে? যোগের পথ অবলম্বন করিয়া অন্তরের দিকে গতি হয়। বাহিরে জড়, মধ্যে জড় শরীর, ভিতরে চেতন। মধ্যের পথ সেতু। সেই সেতু দিয়া জড় হইতে মনে পৌছিতে পারা যায়। যোগীর গতি পৃথিবী ছাড়িয়া শরীরের ভিতর দিয়া মনের মধ্যে। এইটি গমনের প্রথম পথ। দ্বিতীয় পথে বিপরীত গতি. মনের ভিতর দিয়া জগতে আসা। গমন প্রত্যাগমন, প্রবেশ এবং বাহির হওয়া. এ গতি অতিক্রম করিবে না। দেখিও যেন ঐ পথের ব্যতিক্রম না হয়। প্রথম বাহির হইতে ভিতরে গতি। যোগের রক্ত বাহির হইতে ভিতরে যাইবে। সেখানে পরিষ্কৃত হইলে বাহিরে আসিবে। যোগের গাঢ়তা গভীরতা ভিতরে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগনিবন্ধন ভিতরের দিকে। ভিতরে যাইতে বাহিরের জ্ঞান অবরোধ করে সুতরাং নয়ননিমীলন। ধ্যান নেত্র নিমীলন করিয়া,

উপাসনা চক্ষু বন্ধ করিয়া, সমাধি অভ্যাস নয়ন মুদ্রিত করিয়া। ঈশ্বরে মগ্ন হইলে চক্ষু নিমীলিত হয়। সংযম ও চিত্তনিগ্রহের গূঢ় অর্থ এই, বাহিরের ব্যাপার হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া ভিতরে যাওয়া। বিষয়ী মনের ইচ্ছা বাহিরে থাকা, ভিতর হইতে বাহিরে আসা।

সংসারে মন সর্ব্বদা বাহিরে আইসে। বাহিরে আসিয়া নানা কার্য্য করে, মন নিয়ত বাহিরের বিষয়ে থাকে। যোগ আরম্ভ হইবামাত্র সংসারের দিকে অবস্থিত মুখ অন্তর্মুখ হয়। সংসারী ভিতরের দিকে পরাঙ্‌মুখ, যোগারব্ধ সাধক বাহিরের দিকে পরাঙ্‌মুখ। যোগারম্ভে চক্ষু নিমীলন করিয়া সমস্ত লইয়া ভিতরের দিকে গমন। পথিক পথে চলিতেছে। গম্য স্থান এ দিকে নহে জানিবামাত্র সে যেমন মুখ ফিরায়, তেমনি অজ্ঞানতা বশতঃ মনুষ্য ক্রমে সংসারের দিকে চলে, উপদেষ্টার কথা জ্ঞানের কথা শুনিবামাত্র ভিতরের দিকে গতি আরম্ভ করে। ধ্যানে চক্ষু নিমীলিত হয়, সমাধিতে চক্ষু নিমীলিত হয়, ভাবিতেই নয়ন নিমীলিত হয়। ইহাতে বিঘ্ন কম। ঈশ্বরের সত্তা ভিতরে, বাহিরে বিষয় আক্রমণ করে। কোথায় বসিয়া যোগ করিবে? হৃদয়স্থানে, বাহিরে নহে। বাহিরের যাহা কিছু সমুদায় এক একটি করিয়া বিদায় করিতে হইবে।

চক্ষু নিমীলন করিলে হৃদয়ে ছিদ্র করিয়া মন চোর বাহিরে আইসে, চুরী করিয়া সংসার সাধন করে। দ্বার

অবরুদ্ধ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, চিন্তা করিতে লাগিলে, ঈশ্বর এবং পরকালের বিষয় ভাবিতে লাগিলে, ইতিমধ্যে পূর্ব্ব অভ্যাস এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে যে মন ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিল। যে মানুষ সর্ব্বদা মাঠে বেড়ায়, সুপ্রশস্ত সুন্দর আকাশ সর্ব্বদা যাহার মস্তকের উপরে, দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতরে রাখিলে তাহার প্রাণ হাঁপ হাঁপ করে, সে দৌড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা পায়, বাহিরে আসিলে তৃপ্ত হয়। সেইরূপ সংসারের মাঠে অনেক স্থানে বিচরণ করিয়া হৃদয়ঘরে চক্ষু বন্ধ নিশ্বাস অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে মন চক্ষু খুলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, পলায়ন করিবে। যদি তাহাও না পারে ভিতরে এদিক ওদিক্ দিয়া গর্ত্ত করিয়া বাহিরে আসিবে। বদ্ধ থাকিয়া সে বাহিরের বিষয় ভাবিতে লাগিল, ছিদ্র দিয়া বাহিরের জগতে আসিয়া পড়িল। সকলে ভাবিতেছে মন ভিতরে আছে, ওদিকে সে বাহিরে গিয়াছে। সংসার-ভাবনায় তাহার লালসা, সুতরাং তাহাকে শাসন করিতে হইবে। সমুদায় শাসন নিপীড়ন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চায় এই জন্য ভিতরে রাখা কঠিন। মন অনেক ক্ষণ ভিতরে থাকিতে পারে না, চিন্তাতে কল্পনাতে বিষয় ভাবে। সাধন ও অভ্যাস দ্বারা মনকে ভিতরে টানিয়া আন, সমুদায় ছিদ্র বন্ধ কর। এইরূপে ক্রমে শাসন দ্বারা বাধ্য করিয়া যাহাতে উহাকে ভিতরে রাখিতে পারা যায়

তজ্জন্য যত্ন যোগীর প্রথম কর্ত্তব্য। ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া কি, পরে বলা যাইবে। ভিতরে যাইবার সময় একটি বিষয় বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে। যেমন বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে চলিলে, সেখানেও তেমনি বস্তু আছে, সৎপদার্থ আছে। যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে যাইতে হইবে, সেখানে সব পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমুদায় শোণিত সমুদায় নিশ্বাস ভিতরে টান। প্রকৃত যোগশাস্ত্রের অর্থ সাধনের দ্বারা মনের গতিকে জীবনের গতিকে ফিরাইয়া ভিতরে লইয়া যাওয়া, চক্ষু কর্ণাদির ভিতরে গতি। পথ ভিতরে, সেখানে ভিতরে শব্দ শুনিবে এই যোগশাস্ত্র। সেখানে মনোরূপ সরোবরে ব্রহ্মচন্দ্র দেখা যায়। অস্থির করে নিশ্বাসবায়ু, তাই তাহার প্রতিভা পড়ে না। বায়ু রুদ্ধ হইলে মন স্থির হইবে। এ শ্বাস বিষয়ের উচ্ছ্বাস। বিষয়ের উচ্ছ্বাস অবরোধ করিলে মন স্থির হয়, বাহিরের শ্বাসাবরোধ নহে। সিদ্ধি স্বাভাবিক পথে।

ভক্তির মূল।

হে ভক্তিধর্ম্মার্থী ব্রাহ্ম, ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছ ভক্তির লক্ষণ কি। হৃদয়ের কোমল অনুরাগই ভক্তি। সত্যং শিবং সুন্দরং ভক্তির বীজ মন্ত্র। ঈশ্বরের স্বভাবের এই তিন ভাব ক্রমান্বয়ে আত্মাতে তিনটি অনুরূপ ভাব উত্তে-

জিত করে। জীবাত্মার সেই তিন ভাব দ্বারা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপ ধৃত হয়। যথা;—

শ্রদ্ধা দ্বারা সত্যম্;

প্রীতি দ্বারা শিবম্;

প্রগল্‌ভা বা উন্মত্ত ভক্তি দ্বারা সুন্দরং ধৃত হয়।

"তুমি আছ" শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলি। "তুমি ভাল" প্রেম কিংবা প্রীতির সহিত এই কথা বলি। "তুমি সুন্দর" ভক্তির সহিত এই কথা বলিয়া মত্ত হই।

যথার্থ ভক্তির সাধন শিবং এবং সুন্দরং এই দুইয়ের মধ্যে। ঈশ্বরের এই দুই স্বরূপ ভক্তিসাধনের পত্তনভূমি। এই দুই স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি বর্দ্ধিত হয়। প্রীতি কিংবা প্রেম ভক্তির আদি অবস্থা, প্রমত্ততা ভক্তির পরিপক্কাবস্থা। প্রেম বীজ, মত্ততা ফল। প্রেম শৈশব, মত্ততা যৌবন। প্রেমেতে জন্ম. মত্ততাতে পরিত্রাণ। ইহার মধ্যে পুণ্য কৈ? ভক্তিশাস্ত্রে পুণ্য কৈ? যে ভূমিতে পাপ পুণ্য সে ভূমিতে ভক্তি নাই। পাপ পুণ্যের অতীত যে স্থান সে স্থানে ভক্তি। ভক্ত কি পাপ করিতে পারে? না। ভক্তির সঙ্গে পুণ্যের কোন সংস্রব আছে? না। ভক্তিই কি পুণ্য? তাহাও নহে। তবে ভক্ত কি পাপী হইতে পারে? না। তবে ভক্ত কি পুণ্যবান্? নিশ্চয়ই ইহা কেবল দ্বিরুক্তি। গূঢ় তত্ত্ব এই নীতির ভূমি স্বতন্ত্র। পুণ্য স্থাপন হইলে তবে ভক্তি আরম্ভ হয়। যখন পাপ

চলিয়া গেল, পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ হইল। মনুষ্য সচ্চরিত্র না হইলে ভক্তির প্রশ্নই আসিতে পারে না। কিন্তু মানুষ দুই ভাবে সচ্চরিত্র হইতে পারে। এক কঠিন ভাব, আর এক কোমল কিংবা মধুর ভাব। কোন কোন পুণ্যের অবস্থা কঠোর ব্রত পালন, কোন কোন পুণ্যের অবস্থা অতীব মধুর এবং কোমল। এই শেষোক্ত মধুর অবস্থা যাহার আরম্ভেও আনন্দ, ইহাই ভক্তির অবস্থা। প্রকৃত ভক্তি কোথায় হয়? পুণ্যভূমির উপরে। ভক্তি এসে রঙ্গ দেয়, সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। ছবি ঠিক হইতে পারে অথচ তাহা বর্ণবিহীন শুষ্ক দৃশ্য, দেখিতে মনোহর নহে। সেই ছবিতে রঙ্গ দাও তাহা মনোহর হইয়া উঠিবে। সেইরূপ একব্যক্তি সচ্চরিত্র হইতে পারে, তাহার চিত্তভূমি নির্ম্মল হইতে পারে, অথচ তাহার মধ্যে ভক্তিসৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে। ভক্তি এসে সেই ভূমিকে অনুরঞ্জিত করে। ভক্ত হবে কিনা ইহার অর্থ কি? স্থির হয়ে শুন। যাহার প্রকৃতি পুণ্যের অবস্থা লাভ করিয়াছে তাহাকে প্রেম, অনুরাগ, শান্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত করা, অথবা সুপ্রসন্ন করা ভক্তির কার্য্য। শুদ্ধ নীতিপরায়ণ হইলেই মনুষ্য ভক্ত হয় না। এক ব্যক্তি সত্য কথা কহিতে পারে, পরোপোকার করিতে পারে, কর্ত্তব্যানু-বোধে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে, সমুদায় পাপ হইতে বিরত থাকিতে পারে,

অথচ ভক্তিশূন্য হইতে পারে। কিন্তু অসচ্চরিত্র ব্যক্তি কখন ভক্ত হইতে পারে না। এই কথা বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া উচিত। ভয়ানক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ভক্ত হইয়াও মানুষ পাপ করিতে পারে। পাপ রয়েছে যেখানে সেখানে ভক্তি আসিতে পাবে না। মন পূর্ব্বেই পবিত্র হয়ে রয়েছে, ভক্তি এসে কেবল তাহাকে অনুরঞ্জিত করে। ভক্ত হইয়া মানুষ পাপ করিতে পারে যাহারা এ কথা বলে, ভক্তিশাস্ত্রের আদি উৎপত্তি কোথায় তাহারা জানে না। শেষে পরিশুদ্ধ হইব ইহা ভক্তের লক্ষ্য নহে। পাপ ছাড়, পুণ্য গ্রহণ কর, ইহাতেই যদি পরিত্রাণের শাস্ত্র সমাপ্ত হইত তবে আর এই নূতন ভক্তি শাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না। যদি বল ভক্তিশাস্ত্র কেন আরম্ভ হইল ? ব্যাকুলতা ইহার মূল। ব্যাকুলতাসূত্রে ভক্তি শাস্ত্রের সূত্রপাত। ঈশ্বরে বিশ্বাস হইয়াছে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, পরোপকার করিতেছি, তথাপি হৃদয় হঠাৎ বলিল "আমার ভাল লাগ্‌ছে না"। এই ব্যাকুলতা হইতেই সুন্দর নূতন ভক্তিশাস্ত্রের আরম্ভ হইল। বিশ্বাসী কঠোর সাধন করিয়া পুণ্যের অবস্থা লাভ করিতেছে, রীতি, নীতি, সুশৃঙ্খলামতে পারিবারিক এবং সমাজিক ধর্ম্ম পালন করিতেছে, জ্ঞানচক্ষে দেখিলে সমুদয় পরিষ্কার এবং অবশ্য সন্তোষকর বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু হৃদয় বলে চিৎকার করিয়া, "ভাল লাগে না"। তখন শাস্ত্রকার ঈশ্বরের আর এক শাস্ত্র দেওয়া আব-

শ্যক হইল। ঈশ্বর বলেন কেন আমার সন্তান এখনও কাঁদে; কেন বলিতেছে "ভাল লাগে না"। সন্তানের হৃদয়ের এই গভীর বেদনা, এই ব্যাকুলতা, "ভাল লাগে না" ইহা দেখিয়া ঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্র প্রাকাশ করিলেন। অন্য হেতু নাই অন্য হেতু হইতে পারে না, কেবল এক হেতু ভাল লাগেনা, অর্থাৎ সুখ হল না। কি চাই? সুখ চাই, আনন্দ চাই। সমস্ত ভক্তি শাস্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ সাধনের প্রথমে এই ব্যাকুলতা। আমি যত দূর ঈশ্বরকে দেখ্‌ছি ইহাতে ভাল লাগে না। মন কত ক্ষণ কাঁদে যত ক্ষণ না অস্থিরতা, এবং মনের জ্বালা যায়। ভক্তিশাস্ত্রে ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম নাই, যথার্থ অযথার্থ নাই, কেবল ভাল লাগা আর ভাল না লাগাই এই শাস্ত্রের কারণ। তোমার ভক্তি হইয়াছে, এই প্রশ্নের অর্থ এই, তোমার কি ভাল লাগে? ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম্ম, নীতি, এ সকল কি তোমার ভাল লাগে? যদি ভাল না লাগে তাহা হইলে ভক্ত নহ। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত, পাঁচ জনের সঙ্গে থাকা কি তোমার ভাল লাগে? ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে শরীর পুলকিত হয়। যিনি পুলকিত তিনিই ভক্ত। পুলকবিহীন যে সে অভক্ত। যত আহ্লাদ, যত দুঃখ কম তত ভক্ত। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন ব্যাকুলতা হয়? ইহার হেতু নাই। ব্যাকুল ভক্ত বলেন, আমি আর কোন রূপ দেখিতে চাই। কেন চাই? হেতু নাই। আমার

প্রাণ কাঁদছে। এই জন্য ভক্তি অহৈতুকী। ইহার কোন হেতু নাই। ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঈশ্বরকে ভাল লাগছে কেন? ভাল লাগছে, হেতুর হেতু সেই হেতু কেবলই চক্রের মধ্যে ঘুরিতেছে। ইহার পর হেতু নাই। যখন ছট্ফটানি এল, তখন তোমাকে পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম দিলেও বাঁচ্‌বে না। এই বেশ ছিল, আর পলকের মধ্যে গেলাম গেলাম বলিয়া ঈশ্বরের সন্তান চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার শরীর যেন খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। ভয়ানক মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও তাহার যন্ত্রণা অধিক হইল। এই অবস্থা হইল, এর কেন নাই, এর হেতু নাই। যদি কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার, তবে কেবল এই বলিতে পার, আত্মা বিকল হয়েছে। সেই লোক কাঁদছে, কেন কাঁদছে তার হেতু নাই। তিনি অনভিজ্ঞের ন্যায় বলিলেন, কেন আমি জানি না ক্রন্দনে হৃদয় বিদারণ হইল, আবার দশ মিনিটের পর শান্তির অবস্থা আসিল! কেন হাসিল কেন কাঁদিল সে তাহা জানে না। কান্না ভক্তির পথ আরম্ভ করিয়া দিল, হাসি তাহার পর আসিল। যদি না কাঁদ তুমি ভক্ত নহ। যত পরিমাণে ব্যাকুলতা হবে, আর ঈশ্বরকে না দেখে থাকতে পারি না, এইভাব আলিঙ্গন করিবে, তত এই ব্যাকুলতা ভাব দ্বারা প্রেমময়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবে। আজ অহৈতুকী ভক্তির কথা বলিলাম, সাধন দ্বারা ভক্তি কিরূপে হয় পরে বলিব।

অন্তরে বাহিরে ভ্রমণ।

হে যোগশিক্ষার্থ ব্রাহ্ম, তুমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ যোগ শিক্ষা করিতে হইলে গতি কোন্ দিকে, কোন্ পথ দিয়া চলিতে হইবে। প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতর দিকে। হাত দুটি, পা দুটি, চক্ষু দুটি, কাণ দুটি বাহির হইতে ভিতরে যাইবে। দুটি হস্তে আর জড় বস্তু ধরিবার জন্য বাঞ্ছা থাকিবে না; কিন্তু দুটি হাত জোড় করিয়া ভিতরের বস্তু ধরিতে ইচ্ছা হইবে। যে পা সংসারের দিকে চলিতেছিল, তাহার বিপরীত দিকে গতি হইবে। যে দিকে রাস্তা ছিল না মনে করিতে, সেই দিকে রাস্তা খুলিবে। চক্ষু দুটি উল্‌টাইয়া গেল ভিতরে। কর্ণ দুটির আর বাহিরের সুললিত বাক্য ভাল লাগিবে না, ভিতরে ব্রহ্মবাণী শুনিবার জন্য ফিরিবে, সেই আকাশবাণী শুনিবার জন্য ভিতরে যাইবে। সেই মানুষটি ক্রমাগত ভিতরের দিকে চলিল। এক দিন যায়, একমাস যায়, ছয় মাস যায়, এক বৎসর যায়, ভিতরের পথ আর ফুরায় না। বাহিরে যেমন অনেক দীর্ঘ পথ ভিতরের পথও তেমনি অনেক দূর। ভিতরের দিকে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্থান আছে। উপাসনা করিতে হইলে চক্ষু মুদিত করিতে হয়, ধ্যান করিতে হইলে কাণ বন্ধ করিতে হয়, পূজা করিতে হইলে হাত দুটি জোড় করিতে হয়, পা দুটি সঙ্কুচিত করিতে হয়। যত বার উপাসনা করিবে, তত বারই এ সকল ইন্দ্রিয়কে বাহির

হইতে ভিতরে লইয়া যাইতে হইবে। বাহিরে যেখানে গোল, সেস্থান হইতে দূরে গিয়া ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। যোগের প্রথম অবস্থা, প্রথম গতি এই। আরাধনা, ধ্যান, চিন্তা, সঙ্গীত, সমুদায় ভিতরে। এইরূপে ভিতরের দিকে গিয়া সাধন করিতে করিতে জীবন খুব আধ্যাত্মিক হয়, হস্তপদাদিকে সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিয়া ভিতরের দিকে যাইতে আমোদ হয়। যোগশিক্ষার্থী, এখানে কি যোগ শেষ হইল? তুমি বলিবে না। পথিক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গিয়াছিল, আবার সে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিল। প্রথমে বাহির হইতে ভিতরে, সাকার হইতে নিরাকারে যাইতে হয়। সেখানে অদৃশ্য দৃষ্ট হইল, অশব্দ শ্রুত হইল। তার পর ঈশ্বর অঙ্গুলি নির্দ্দিশ করিয়া বলিলেন, যোগী তোমারত ঘরের কাজ হইয়াছে। ভিতরে যাওয়া ভিতরে থাকিবার জন্য নহে; এখন তুমি আবার বাহিরে যাও। আবার দেখি যোগী সংসারে গেল, হাত পা ছড়াইল। ওকি; হাত ধরিতে যায়, ওকি পা চলে যে, ওকি চক্ষু বাহিরের বস্তু দেখে যে, ওকি যোগীর কাণ বাহিরের কথা শুনে কেন? তবে বুঝি যোগ ভাঙ্গিয়াছে, স্থূলদর্শী এই কথা বলে। সূক্ষ্মদর্শী বলে যোগ জমিয়াছে, অথবা যোগীর জীবন জমাট হইয়াছে। চক্ষু মুদিত করিয়া নিশ্চিতরূপে অন্তর্জ্জগৎ দেখা হইল, পরেও যদি চক্ষু মুদিত রাখা হয় সে নিকৃষ্ট

যোগী। পা চলুক তুমিও চল, চক্ষু দেখুক তুমিও দেখ, যখন ভিতরে ছিলে তখন নিরাকারে নিরাকার দেখিয়াছ, এখন সাকারে নিরাকার দেখ। প্রথমাবস্থায় বাহ্য জগৎ হইতে তোমার সমুদায় শক্তি প্রত্যাহার করিয়া ভিতরের দিকে বিস্তার করিয়াছিলে, এখন বাহ্য জগতে বসিয়া নিরাকারের ধ্যান, আরাধনা, দর্শন, প্রভৃতি সমুদায় আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন কর। প্রথমে চক্ষু খোলা যেমন দোষ, পরে চক্ষু বোজাও তেমনই দোষ। তখন ভিতরে থাকা দুর্ব্বলতার পরিচয়। যে কেবল পশ্চিমে গেল পূর্ব্বে ফিরিল না, তার অর্দ্ধেক যোগ হইল। দাঁড়াও, গোলাকার পৃথিবীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গেলে, যদি ক্রমাগত চল, তোমাকে আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিতেই হইবে। এ যে ভিতরের দিক্ দিয়াই আসা, এ তো পতনের ন্যায় ফিরিয়া আসা হইল না। যোগী সর্ব্বদা অগ্রগামী, যোগীর পক্ষে ঈশ্বর সর্ব্বদাই সম্মুখে, পশ্চাতে নহেন। দেবতা সমক্ষে। যোগশাস্ত্রত তবে প্রলাপের কথা বলিল, যদি ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া যোগীকে সংসারে ফিরিতে হয়। যথার্থ যোগসাধনের জন্য বাহির হইতে ভিতরে গেলে, ভিতরেই যাও, কিন্তু দেখিবে দেখিতে দেখিতে তুমি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছ। কেন না গোল পথ। প্রথমাবস্থায় স্ত্রীপুত্রকে নিরাকার করিয়া লইতে হয়, তখন বাহিরে আসিলেই যোগ ভঙ্গ হয়। তখন যদি হাত বাহিরের একটি বস্তু

ধরিল, অমনি আর ভিতরের বস্তু স্পর্শ করিতে পারিল না। যাই কাণ বাহিরের বাদ্য শুনিল, অমনি ভিতরের ব্রহ্মবাণী শুনা বন্ধ হইল, এই প্রথমাবস্থার ঠিক কথা। প্রথমে সমুদায় নিরাকার, সাকার দেখিতে হইবে না।

তার পর যখনি সময় হইল, তখন সাকারে নিরাকার দেখিতে হইবে। তুমি মুখ ফিরাও নাই, যেমন দৃষ্টান্ত দিলাম পৃথিবী গোল। তুমি সংসার ছাড়িয়া ভিতরে গেলে, তার পর আবার চলিতে চলিতে সংসারে আসিলে। যে ভিতর দিয়া না গিয়াছে সে দেখে সাকারে সাকার, আর যে নিরাকারের ভিতর দিয়া আসিল সে জড়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাব দেখে, স্ত্রীর ভিতরে স্ত্রীর ভাব, মাতার ভিতরে মাতার ভাব, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সেই জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না, বজ্রাঘাতে শক্তির শক্তি, আপনার শরীরে সেই আত্মা স্থাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পরমাত্মা, চক্ষুর ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের মধ্যে তিনি প্রাণ। যখন ভিতরে যোগ করিয়া বাহিরে আসিলে তখন ধর জড়; কিন্তু ধরছ নিরাকার। শুনছ, দেখ্‌ছ জড়, কিন্তু তাহা নহে, সকলই নিরাকার। বসেছ জড়ের উপর; কিন্তু তাহা নহে, নিরাকার। মায়াবাদীর মতের এখানে অর্থ। এসব ছাড়া যে যোগী সে নিকৃষ্ট যোগী। সেই যোগী ভিতরে গেল, কিন্তু সে পথে বসিয়া পড়িল, চলিল না, চলিত যদি পুনরায় এই নিকৃষ্ট জগতে

আসিত। এই সকল লোকদের সঙ্গে অগ্রগামী যোগীর দেখা হইবে। এরা সাকারে সাকার দেখে, তিনি সাকারে নিরাকার দেখেন। তাঁহার চক্ষে সকলই ব্রহ্মময়, আকাশ-ময় ব্রহ্ম, জ্যোতির ভিতরে ব্রহ্ম। ভিতর থেকে বাহিরে আবার বাহির থেকে ভিতরে, আবার ভিতর থেকে বাহিরে আবার বাহির থেকে ভিতরে, একবার যাওয়া আবার আসা, আবার যাওয়া, আবার আসা—কি নির্ম্মাণ হইল? যোগ চক্র। যোগীর পরিপক্কাবস্থায় দুই এক হইবে। যোগীর পক্ষে একটা উপসনার অবস্থা, একটা পৃথিবীর ব্যাপার, তাহা নহে, সকলই ব্রহ্মের ব্যাপার। বাহিরে ব্রহ্ম ভিতরেও ব্রহ্ম; কিন্তু জগৎ ব্রহ্ম নহে, মনও ব্রহ্ম নহে। ভিতরে হাত দিলে কি হয়, মনের ভিতর ব্রহ্ম, বাহিরে হাত দিলে কি হয়, জগতেও ব্রহ্ম। এইরূপে যোগী ভিতরে গেল বাহিরে এল, ভিতরে গেল বাহিরে এল, ভিতরে গেল বাহিরে এল, ক্রমাগত যোগচক্র এত ঘুরতে লাগল যে আর ভিতর বাহির দেখা যায় না। সেই চক্র যখন এত অধিক দ্রুতবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল যে আর গতি দেখা যায় না, তখন যোগসিদ্ধ হইল। সেই অবস্থায় স্ত্রী পরিবা-রের প্রতিপালন করিতে আর ভয় নাই, ব্রহ্মময় সমুদায় স্থান। এইরূপে যখন ভিতর বাহিরে দুই রাস্তা এক হইয়া যায়, তখন সাধক যোগেতে সিদ্ধ হন।

পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, তুমি শুনিয়াছ যে ভক্তির ভূমি স্বতন্ত্র, যেখানে পাপ পুণ্য আছে তাহা ভক্তির ভূমি নহে। যেখানে পাপ পুণ্যের কথা নাই, পাপ পুণ্যের কথা নিষ্পত্তি হয়েছে, অর্থাৎ অন্তর পবিত্র হয়েছে, সেই পবিত্রতাকে অনুরঞ্জিত করিবার জন্য, সেই পবিত্র ভূমিকে স্বর্গের বর্ণে বিভূষিত করিবার জন্য ভক্তির আবির্ভাব হয়। গৃহ প্রস্তুত হইল, রঙ্গ দেওয়ার জন্য ভক্তির প্রয়োজন। সমুদয় নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, অট্টালিকা প্রস্তুত, ভক্তি এসে কেবল তাহাকে স্বর্গীয় বর্ণে সুশোভিত করে। শুদ্ধ হইয়াছ, শুদ্ধ হওয়ার পর এই প্রশ্ন আসিল। শুদ্ধ হয়ে কেবল কি শুদ্ধ থাকবে, না শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সুখী হবে? যে বলে আমি কেবল শুদ্ধ থাকব সে ধর্ম্মের পথে রইল ভক্তির পথে গেল না।

এতৎসম্বন্ধে আর এক কথা আছে। ভক্তির ভূমি যদিও সাধারণ পাপ পুণ্যের অতীত; কিন্তু ভক্তি আপনার পাপ পুণ্যের একটি নূতন শাস্ত্র নির্ম্মাণ করে। সেই উচ্চ ভূমিতে ভক্তির নূতন প্রকার অভিধানে সে সকল পাপ পুণ্য লিখিত হয়। নিম্ন ভূমির অধর্ম্ম কি? ক্রোধ, লোভ, পরদ্বেষ, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন ইত্যাদি। নিম্ন ভূমির পুণ্য কি? ইন্দ্রিয়দমন, পরোপকার, সত্য কথন, ইত্যাদি। ভক্তি

রাজ্যে এ সমুদায় পাপ পুণ্যের কথাই নাই। ভক্তির অভিধানে, পাপ আছে, ভক্তির মধ্যেও আবার বিধি নিষেধ আছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম আছে ন্যায় অন্যায় আছে। ভক্তি রাজ্যের পাপ কি? শুষ্কতা। ভক্তি রাজ্যের পুণ্য কি? প্রেমের উচ্ছ্বাস। যার মনে শুষ্কতা, এবং নিরাশা আসে, যার মনে জগতের প্রতি প্রধাবিত প্রেমের ভাব নাই, যে ভাই ভগ্নীর অনুরাগ অনুভব করিতে পারে না, সেই নিরাশ শুষ্কহৃদয় ব্যক্তিকে ভক্তেরা আপনাদের মধ্যে রাখিতে কুণ্ঠিত হন। নিম্নভূমিতে নরহত্যা যেমন মহাপাপ, ভক্তি রাজ্যে একেবারে শুষ্কতা তেমনই মহাপাপ। ভক্তি রাজ্যে পাপ এই, সত্য কথা কহিলে, অথচ সুখ হইল না, উপাসনা করে গেলে অনেক ক্ষণ, অথচ প্রেম উথলিত হইল না, ভাই ভগ্নীদের অধীন হয়ে অনেক কাজ করলে; কিন্তু ভাই বলিবামাত্র যে মত্ততা হয় তাহা হইল না। ভক্ত প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করেন, আমার মন ভক্তিসম্বন্ধে আজ কি কোন পাপ করেছে? মন যদি বলে আমার প্রাণ দুই ঘণ্টা প্রেমবিহীন ছিল, তৎক্ষণাৎ কি সর্ব্বনাশ করেছি বলে ভক্ত অনুতাপ করেন। এত ক্ষণ আমার প্রাণ খাক্ হয়ে ছিল, এখনও আমার প্রাণের ভিতরে এমন গভীর পাপ আছে, এই বলিয়া ভক্ত ক্রন্দন করেন। এক বার যদি মন নিরাশ হয়, যথার্থ ভক্তের প্রাণ চীৎকার করিয়া উঠে। কি, আমি কি তবে দয়াল নাম মানি না, এইরূপ অতি সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় পাপ

সকল দেখিয়া ভক্ত ভীত হন, এবং এই জন্য সর্ব্বদা ভক্তি পথে সাবধান হইয়া চলিতে হয়।

ভক্তি রাজ্যের স্বর্গ কি? সর্ব্বদা প্রেমসরোবরে বাস করা। ভক্তি রাজ্যের নরক কি? একটী শুষ্ক মরুভূমি পাথরের ন্যায় স্থান যাহাতে এক ফোটা জল পাওয়া যায় না। নরক ত্যাগ কর, স্বর্গ গ্রহণ কর। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্যাকুলতা ভক্তির আরম্ভ, প্রেম, শান্তি ভক্তির ফল। প্রথম সেই শুষ্ক বালুরাশি, সেই কঠিন পাথররূপ নরক দেখিয়া অনুতাপের ক্রন্দন, শেষে সেই পাথর বিগলিত হইল দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ, আনন্দ জলরাশি। পাথরকে করতে হবে জল, কলিকে করতে হবে মধু। পাথরকে সরোবর করতে হলে, জলের প্রয়োজন; এই জল, প্রথমে অনুতাপের ক্রন্দন হইতে উৎপন্ন কর। এক্ষণে চক্ষু সহায়, কেন না চক্ষু জলদাতা। এইজন্য চক্ষু কেঁদে ভক্তি আরম্ভ করে। কি জন্য কাঁদে, ভক্ত জ্ঞানী নহে, সুতরাং তাহার কারণ জানে না। আমার গায়ে সমস্ত দিন কেন স্ঁচ ফুটছে, এখন জ্বর হল কেন, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না কেন? এবংবিধ চিন্তা দ্বারা ভক্ত অপনাকে অস্থির করে ফেলেন। ভাল লাগে না, অত্যন্ত দুঃখ, অত্যন্ত কষ্ট যন্ত্রণা; যার মনে এটি নাই সেখানে ভক্তি নাই। এত বেলা হল, এখন তাঁহার সঙ্গে দেখা হল না, এই বলিয়া ভক্ত কাঁদিয়া উঠিলেন। এই সুখে ছিলেন, হঠাৎ আবার এ সকল

দুঃখের কথা। এই বিলাপ ধ্বনিতে জল পড়ে। এইটি ধর্ম্মরাজ্যের কৌশলে সাধন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ এত, কিছু পায়নি বলে ক্রন্দন, অভক্তিও তার পরিত্রাণ পক্ষে সহায় হয়। ভক্তি হলেত আহ্লাদ হবেই। যখন বলছে আমার মন পাথরের মত, তখনই অনুতাপের অশ্রু পড়িয়া সেই কঠিন মন গলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মরাজ্যের কি আশ্চর্য্য কৌশল!! খুব ঘনকাল মেঘের ন্যায় বিষাদের তীব্র অশ্রুজলে সেই পাথর গলে যাচ্ছে। আমার পাথর কেন গলিল না, আমার কঠিনতা কেন ঘুচল না, ভক্তি পাওয়া হইল না, এই ভেবে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমার বাড়ীতে প্রেমময় নাই, ইহা ভাবাই প্রেমময়কে ডাকা। না পাওয়াই পাওয়ার মূল, এই জল, সাধনের আরম্ভ। তার পর ক্রমে সেই জলের আকার পরিবর্ত্তন হয়। দুঃখের জল সুখের জলে পরিণত হয়। প্রথমে শক্ত মনকে নরম করিতে, অহঙ্কারী মনকে বিনয়ী করিতে, কঠিন মনকে কোমল করিতে, অনুতাপের তীব্র অশ্রু পড়িতে লাগিল; কিন্তু যে জলে পাথর গলে সে জলে উদ্যানের ফুল ফুটে না; বিষাদের জল পড়িলে উদ্যান কাল হইয়া নষ্ট হয়। এই জন্য ঈশ্বরের এমনই কৌশল, অনুতাপের পর সহজেই ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ বারি বর্ষণ হয়. সেই আনন্দ বারিতে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিতে লাগিল, ভক্তের হৃদয়উদ্যানকে আরও মনোহর করিল। জল

প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। সাধনের আরম্ভ ব্যাকুলতার জল, সাধনের শেষ শান্তির জল। গেলাম রে, মলাম রে, এ সকল কথা ভক্তির আরম্ভে, আঃ, পেয়েছি, বাঁচলাম, এ সকল কথা ভক্তির শেষ অবস্থায়। যে সুখ পেতে চাও, সেই সুখের জন্য কি কাঁদ্‌ছ? যদি না কাঁদিতে থাক, তবে বাহিরে যাও, এখনও আরম্ভের সময় হয় নি। ভক্তি কি চাও তুমি? প্রাণ কি তোমার কাঁদে? ভয়ানক জ্বরের জ্বালার ন্যায় কি মন অস্থির হইয়াছে? ব্যাকুলতার কি কষ্ট কে জানে এ পথের পথিক বিনা। তোমরা মনে কর, শীঘ্র শীঘ্র পথিক হইব; কিন্তু ব্যাকুলতা কৈ? তোমরা বল আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু ভক্তিরাজ্যের উপদেশ এ কথা মানিবে না। তোমার চক্ষের জলে প্রাণ ভাসে কি না? উপাসনা ভাল হয় না বলিয়া তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হও কি না, ভাই ভগ্নীদিগকে ভাল বাসিতে পার না বলিয়া তুমি অনুতাপে অস্থির হও কি না? বলিতে হইবে না, তোমার মুখের চেহারা দেখে বুঝা যায়, সময় আসে নাই। তোমার মুখে এখনও আরামের চিহ্ন রহিয়াছে। তুমি বলিতেছ কেমন করিয়া কাঁদিব ঈশ্বর না কাঁদাইলে। তবে তুমি হেতুবাদী। কে কাঁদাইবে, কবে কাঁদাইবে, কি ভাবে কাঁদাইবে কিছুই জানা যায় না অথচ না কাঁদিলে ভক্তি আরম্ভ হয় না। যদি বল, একটু একটু কাঁদি, ভক্তি-রাজ্যে সে প্রকার আরামপ্রিয় লোকের কাজ নাই। ভক্তির

অভাব সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া কত ভক্ত আপনার শরীর-সকলে কত ভয়ানক কষ্ট যন্ত্রণা দিলেন। অভক্ত কি সেই যন্ত্রণা বুঝিতে পারে? ধন্য ঈশ্বর যে তিনি এই প্রকার হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে ভক্তি কি অমূল্য বস্তু। ক্রন্দনে ভক্তির আরম্ভ, হাসি ভক্তির চিরলক্ষণ। যিনি হাসেন তিনি ভক্ত। ভক্তি হাসি, চির প্রসন্নতা সদা প্রফুল্ল ভাব, পূর্ণ ভক্তি। ভক্তির অভাব কি? কঠিনতা। সে অবস্থায় ক্রন্দনও নাই, হাসিও নাই। পাথর হাসেও না কাঁদেও না। ভক্তির আরম্ভে ব্যাকুলতার যন্ত্রণায় হৃদয় পুড়িয়া যায়, ভক্তির শেষে প্রেম শান্তি আনন্দে হৃদয় চিরপ্রসন্ন। ভক্তির পথ বড়, না যোগ পথ বড়, এ বিচারে প্রয়োজন কি? যোগপথে এখানে থেকে ওখানে যাওয়ার একটি নিয়ম আছে; কিন্তু ভক্ত কেন কাঁদেন কেন হাসেন তার হেতু নাই। কান্না ভক্তির প্রথমাবস্থা, হাসি ভক্তির পূর্ণাবস্থা। পাথর গলিল অনুতাপ জলে সেই জল শেষে আনন্দ জলে পরিণত হইল। কাল সমুদ্র সাদা সমুদ্র হইল। সেই আনন্দের জল নিত্য ভক্তের হৃদয়ে পড়িতেছে। আনন্দ দর্শন, আনন্দ শ্রবণ, আনন্দ স্পর্শন, আনন্দে নিমগ্ন থাকা, এই ভক্তির পূর্ণাবস্থা।

অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন।

হে যোগশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, তুমি যোগের দুই পথ শ্রবণ করিয়াছ। যোগের প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে, দ্বিতীয় পথ ভিতর হইতে বাহিরে। দুই শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতে হয়, এক শ্রেণীতে ভিতরে গিয়া, আর এক শ্রেণীতে বাহিরে আসিয়া। বাহিরে আসিতে হইবে; কিন্তু ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে হইবে, এই যোগসাধনের গূঢ় অর্থ। সংসারে থাকিয়া যোগী হইতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে সংসারের ভিতর থাকিয়া। আমি এক দিকে, ঈশ্বর এক দিকে, মধ্যে সংসার। এই কথাতে বুঝিতে পার সংসার কেন ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক। আমি এক দিকে, ঈশ্বর আর এক দিকে, মধ্যে সংসার, ইহাতে এক প্রকার জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে গ্রহণ হয়। যেমন সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, তেমনই ব্রহ্মগ্রহণ। সংসার যদি মনুষ্য এবং ঈশ্বরের মধ্যে আসে, তাহা সত্য সূর্য্যের কতক অংশ গ্রাস করিবেই, ঈশ্বরের মুখ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে দিবে না: প্রকাণ্ড আকার সংসার মধ্যস্থলে থাকিলে ব্রহ্মের মুখ জীবাত্মা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইবে না, কারণ মধ্যপথে প্রতিবন্ধক। সংসার যোগের ব্যাঘাত করে। তবে এই সংসারকে কি করিতে হইবে যদি ইহা বারংবার আমাদের ধর্ম্মপথে উপস্থিত হইয়া আমাদের উন্ন-

তির প্রতিবন্ধক হয়? এক শ্রেণীর লোক সংসারকে টানিয়া ফেলিয়া দেন, স্ত্রী, পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, একাকী নির্জ্জন বনে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে বসিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করেন। এক যুক্তিতে ইহা ঠিক বোধ হয়, কেন না ইহাতে মধ্যে তৃতীয় পদার্থ পৃথিবী রহিল না। ঈশ্বর এবং তাঁহার সঙ্গে যোগার্থীর মধ্যে যাহা কিছু ব্যবধান ছিল, সেইটি স্থানান্তরিত হইল। মধ্যে যাহা কিছু ব্যবধান সেইটি স্থানান্তরিত করিয়া দুই পদার্থের মিলনই যোগ, আর কিছুই যোগ নহে। সেই সংসার কি যাহা আমাদের যোগের প্রতিবন্ধক? বাহিরে যে সকল ব্যাপার দেখি, এবং তাহারা আমাদের মনে যে সকল ইন্দ্রিয় ও স্বার্থ উত্তেজিত করে তাহা লইয়া অহঙ্কার, স্বার্থ-পরতা, পাপাসক্তি মনের ভিতরে একটি প্রকাণ্ড সংসার নির্ম্মাণ করে। এ সমুদয় যোগের প্রতিবন্ধক, সুতরাং এ সমু-দয়ের নাম সংসার। সমুদয়ের সমষ্টি সেই সংসার একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া আমাদের যোগ ভঙ্গ করে। এক শ্রেণীর মত এই, সংসারকে বিদায় করিয়া দিলে আত্মা পরমাত্মার সন্নিকর্ষ লাভ করে, অথবা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা দুই ভিন্ন পদার্থের মিলন হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধন কি? সংসা-রের সমুদয় ব্যাপার এবং ইহার মধ্যে যত রিপুর উত্তেজনার কারণ, সমুদয়কে মনের ভিতর নিয়ে যেতে হবে, তার পর যখন তাহারা ভিতর হইতে বাহিরে আসবে, তখন সমুদয়

ঈশ্বরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আস্‌বে। পূর্ব্বে সে সমস্ত ব্যাপার ব্রহ্মবিহীন ছিল, তখন সে সমুদায় স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিবে। এখন যাহা মেঘের ন্যায় ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখে, সেই মেঘকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আবার বাহিরে আসিতে দিলে, তাহাই স্বচ্ছ কাচের ন্যায় ব্রহ্ম দর্শনের অনুকূল হইবে। অভ্যাসেতে এ সকল এমন সহজ হইয়া যায়, যে যোগী যখন নিরাকার জগৎ হইতে পুনর্ব্বার বাহিরে আসেন, তখন তিনি সংসারের ভিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, বাহ্য তাবৎ পদার্থে কেবল তাঁহাকেই দর্শন করেন।

ইহা শুনিতে কঠিন কিন্তু প্রকৃত যোগীর পক্ষে ইহা সহজ। সংসারীর পক্ষে সূর্য্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, লতা, এ সমুদয় বাহ্য পদার্থ, এ সমুদয় পদার্থে ঈশ্বর অপ্রকাশ, এ সকল জড়বস্তু আবরণস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু যখন আমরা অন্তরে এ সকলকে লইয়া গিয়া সাধন করি, তখন এ সকলের ভিতরে যিনি আছেন তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। যখন পরিপক্ক হয়ে বাহিরে আসি তখন সাকারেও নিরাকার দর্শন হয়। ভিতরে সাধন করিয়া যখন বাহিরে আসিবে তখন যে ফুল হাতে লইবে, যে জল স্পর্শ করিবে, প্রত্যেক জড় বস্তু সেই নিরাকার অন্তরাত্মাকে দেখাইয়া দিবে। তখন চোক খুলে ধ্যান করা, কাণ খোলা রেখে ভিতরের দৈববাণী শ্রবণ করা

সহজ হইবে। বাহিরে কোকিল ডাকিতে
করিতেছে তার মধ্যে যোগী ব্রহ্মনাম গান ক
যোগী বাহিরের সমুদয় পদার্থ ভেদ করিয়া তাহার
নিরাকার ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তখন ব্রহ্মগ্রহণ হইল না,
অর্থাৎ বাহ্য পদার্থরূপ সংসার ব্রহ্মকে ঢাকিতে পারিল না,
কিন্তু আত্মা সহজে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিল। যোগের প্রথমা-
বস্থায় বাহিরের বস্তু সকল বলে, যোগী, আমাদের সঙ্গে
থাকিলে তুমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না, তুমি বাহির
হইতে ভিতরে যাও; কিন্তু ভিতরে সাধন করিয়া যখন
যোগী বাহিরে আসেন, সে সমুদয় পদার্থই আবার স্বচ্ছ
হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। এই প্রকৃত যোগধর্ম্ম।
সংসার ছেড়ে যাওয়া অন্যায, পাপ। কর্‌তে হবে কি?
সংসারকে বুকের ভিতর নিয়ে স্বচ্ছ করে আন্‌তে হবে।
সংসারের ভিতর দিয়া কেবল অন্তর্জগৎ দেখ্‌তে হবে। এই
যেমন ঈশ্বর সমক্ষে, মধ্যে সংসার, তার পর আমি। যত
বার ঈশ্বরকে ভাব্‌তে যাই সংসার প্রতিবন্ধক হয, সংসার
বিঘ্ন দেয়। অতএব চন্দ্র সূর্য্য, বৃক্ষ, লতাদি ভিতরে
ভাব্‌ব। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে ভাব্‌ব। ক্রমাগত
উন্নত পবিত্র চিন্তা দ্বারা সেই সংসার স্বচ্ছ হইয়া আসিবে
অর্থাৎ সূর্য্যের ভিতর দিয়া, চন্দ্রের ভিতর দিয়া বেশ দেখা
যাইবে, ঐ সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র ঐ দিকে বসে আছেন।
সংসারীর পক্ষে সংসার প্রাচীর, যোগীর পক্ষে সংসার স্বচ্ছ

কাচ : যোগীর নিকট বাহ্য বস্তু অন্তরাল, বা আবরণ বলিয়া বোধ হয় না। যোগী সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখেন যিনি আপনাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্য এ সকল করেছিলেন। যোগী যাহা দেখেন তাহারই ভিতর ঈশ্বরকে দেখেন। সংসারীর পক্ষে সংসারের নানা প্রকার কার্য্য নিকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যোগীর পক্ষে সমুদয়ই ব্রহ্মের ব্যাপার। সমুদয় ঈশ্বরের হস্তরচিত, সকল স্থান ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ।

এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিয়া যোগীর ইচ্ছা সফল হয়। এই সঙ্গে ভ্রম, মায়াবাদ উৎপন্ন হয়। মায়াবাদীরা বলে যদি সর্ব্বস্থান ব্রহ্মময় হইল, জগৎ তবে ছায়া, জগৎ তবে কিছুই নহে। প্রকৃত যোগী ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর আছেন, জগৎ আছে, আমি আছি এই তিনই সত্য। আর তিনি এই বলেন, যোগবল দ্বারা কেবল এই বাহ্য জগৎকে স্বচ্ছ করিয়া লইতে হইবে। মূর্খ বলে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া, যোগী বলেন, সংসারও সেইরূপ ঈশ্বরের সংসার, যেমন আমার মন ঈশ্বররচিত। সংসারেও ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, কেবল সংসারীর নিকট তিনি অপ্রকাশ। আমার ভিতর ঈশ্বর আছেন, এখানে তাঁহাকে শীঘ্র দেখা যায়, আর বাহিরে না কি অনেক স্থূল আকার, অত্যন্ত কোলাহলরূপ সংসার, অনেক আবরণ, এই জন্য সহজে তাঁহাকে দেখা যায় না। ঐ ঢাকা, ঐ আবরণটি তাড়াইয়া

দাও সেখানেও ঈশ্বরকে দেখিবে। প্রকৃত যোগ সংসারকে বিদায় করিয়া দিল না; কিন্তু সংসারের উপর যে মলিন আবরণ ছিল তাহা দূর করিল। সংসার কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতে লাগিল। অতএব সংসার আমাদের শত্রু নহে। অতএব মনের ভিতর গিয়া এমন সাধন কর যে বাহিরে আসিলেও কোন জড় পদার্থ ঈশ্বরকে ভুলাইয়া দিতে পারিবে না। বাহিরে আসিলেও দেখিবে সেই অন্তরস্থ নিরাকার ঈশ্বর সাম্‌নে আছেন, সংসার মধ্যে বেড়াচ্ছেন, কার্য্য কর্‌চ্ছেন। এই রূপে সংসারের সমুদয় ব্যাপারের ভিতরে থেকেও যোগী ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করেন।

কৃপা ও সাধন।

যোগশাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র, হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, এই দুয়ের মধ্যে কেমন প্রভেদ জানিবে, যেমন স্থলে ভ্রমণ ও জলে ভ্রমণ। যোগের পথ স্থলে ভ্রমণ, কারণ ইহার প্রায় সমুদায় ব্যাপারের হেতু দেখা যায়, এই পথে কোন্ কারণ হইতে কি কার্য্য হইল অনেক পরিমাণে তাহা জানা যায়। কিন্তু ভক্তির পথ এরূপ নহে, ভক্তির পথ জলে ভ্রমণ। ভক্তিকে অহৈতুকী বলার কারণ কি? কারণ ভক্তিব্যাপারের হেতু জানা যায় না। ঈশ্বরের হস্ত আমা-

দের অজ্ঞাত এবং অলক্ষিত ভাবে অলৌকিক কার্য্য সকল করে, আমরা তাহার হেতু জানিতে পারি না। যেমন জলের উপর পথ এক বার পরিচিত হইলেও তাহা অপরিচিত থাকে, সেই রূপ ভক্তির পথ। স্থলপথ নির্দ্ধারিত, এক বার পরিচিত হইলে আর অপরিচিত থাকে না। ভক্তি-বারির উপর সাধন করা এই জন্য অনেকটা অহৈতুকী মুক্তির উপর জীবন স্থাপন করা। অতএব ভক্তিরাজ্যে কি কারণে কি হয় তাহা বলা শক্ত। কিন্তু তথাপি ইহা বলা উচিত, ভক্তির ভিতরে ঈশ্বরের কার্য্য এবং মনুষ্যের কার্য্য দুইই আছে। যাহা ঈশ্বরের দিক্ হইতে হয় তাহা দৈবাৎ, তাহার কোন হেতু নাই, দৈব ঘটনা হঠাৎ হইল, কোন হেতু জানা নাই। কেন করিলেন, কি ভাবে করিলেন, কিছুই হেতু নাই। ঈশ্বরের দিক্ হইতে বায়ু কোন্ দিক্ থেকে, কোন্ শাস্ত্রানুসারে, কেন আসে কিছু জানা যায় না। কিন্তু আমরা জানি না এই জন্য কি বাস্তবিক অহৈতুকী? কখন না, মানুষ হেতু বলিতে পারে না এই জন্য অহৈতুকী। ভক্তি কি কেবল দৈব ব্যাপার? না, ইহা এক দিকে যেমন দৈবাৎ, মানুষের দিক হইতে আবার তেমনি সাধনের ব্যাপার। ভক্তিতে সাধন উপাসনাও আছে, আবার দৈবযোগে প্রসাদপ্রাপ্তিও আছে। যিনি অত্যন্ত ভক্ত তাঁহার জীবনও সাধনবিহীন নহে, আর যিনি অত্যন্ত সাধক ভক্ত, তাঁহার জীবনে ঈশ্বরপ্রসাদেরও

অভাব দেখা যায় না। প্রত্যেকের জীবনে দুইই দেখা যায়। তবে কি না, কাহার সাধনপ্রবলা ভক্তি, কাহারও দেবপ্রসাদপ্রবলা ভক্তি। কেবল পরিমাণে অধিক। শ্রেণী-বদ্ধ করিতে হইলে ভক্তদিগকে এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইবে। তুমি শুনিয়াছ কেহ পৈতৃক ধন, কেহ বা নিজ পরিশ্রমজাত সম্পত্তির অধিকারী হয়। দেবদত্ত ভক্তি পৈতৃক ধন, যাঁহার সেই ভক্তি আছে তিনি জন্মাবধি সেই ধনসম্পত্তির অধিকারী। আর এক জন অনেক সাধন, এবং অনেক চেষ্টা দ্বারা ভক্তি উপার্জ্জন করেন, তাহা সাধনের ভক্তি। এক জন দেবদত্ত ভক্তি লাভ করিল; কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সাধন এবং আয়া-সের প্রয়োজন। যাঁহারা অত্যন্ত আয়াসের সহিত ঈশ্বরদত্ত ভক্তি রক্ষা করেন তাঁহারা যেমন ভক্তির মূল্য জানেন, তেমন আর কেহই জানেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভক্তি আসিল; কিন্তু তাহা রাখিবার জন্য যদি উপযুক্তরূপে সাধন করা না হয়, যদি সাধুসঙ্গ না করা হয়, যদি যথারীতি চিত্তশুদ্ধি না রাখা হয়, যদি রিপু প্রবল হয়, তবে সেই ভক্তি আবার পলায়ন করিতে পারে। উপর হইতে জল অনেক পড়িল; কিন্তু চারিদিক্ বাঁধ চাই। ঈশ্বরের কৃপা-বারি অনেক আসিল, কিন্তু সেই কৃপা বারি রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই। আর যাঁহারা বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি লাভ করেন তাঁহাদের পক্ষেও আবার ঈশ্বরের প্রতি

গভীর নির্ভর এবং বিশ্বাস আবশ্যক। তাহা না হইলে অহঙ্কার আসিয়া তাঁহাদের ভক্তির মূল পর্য্যন্ত বিনাশ করিবে। উপর হইতে দেবপ্রসাদ যত আসিতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধন করিলে সে গুলি আরও সবল হয়। ঈশ্বর হইতে দেবপসাদ আসিল, আরও প্রসাদ আসিবে, ভক্ত যদি এরূপ আশা না করেন তাঁহার ভক্তি শুকাইয়া যাইবে। সাধনপ্রবলা ভক্তি দেবপ্রসাদ অস্বীকার করিতে পারেন না, দেবপ্রসাদ ভিন্ন তাঁহার কিছুই সিদ্ধ হয় না। তিনি বীজ বপন করেন, বৃদ্ধি হওয়া, ফল দেওয়া ঈশ্বরের হাতে। আবার দেবপ্রসাদপ্রবল ভক্তেরাও সাধক। যত বার ঈশ্বর দিবেন, তত বার সে সমুদয় রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই; যে যে পথ বলিয়া দিবেন, সেই সকল অবলম্বন করিবার জন্য সাধন চাই। পাওয়ার বেলা, লাভের বেলা হেতু নাই। ঈশ্বর কেন দিলেন, হেতু নাই। কিন্তু যত সাধন করিবে তাহার হেতু আছে। ঈশ্বরের নিকট হইতে কবে সুবাতাস আসিবে, কবে তিনি ফল দিবেন, তুমি কিছুই জান না। আমি সাধন করিয়াছি, অতএব, হে ঈশ্বর, তোমাকে ফল দিতেই হইবে, ঈশ্বরকে এই কথা বলিতে পার না। শীতের সময় হয়ত শীত হইল না, গ্রীষ্ম লইল, গ্রীষ্মের সময় হয়ত শীত হইল। এ সকল ব্যাপারের হেতু নাই। ঈশ্বরসম্বন্ধে যে বিভাগ তার কারণ পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ের

হেতু কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না, যদি করেন অবিশ্বাসী হইবেন। তাঁহার কাছে সাধন করিয়া পড়িয়া থাকিবে। যখন ফল দেওয়ার হয় তিনি দিবেন, তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে।

সার আকর্ষণ।

হে যোগশিক্ষার্থী, একটি পাত্রে কোন বস্তু ছিল, তাহা নিক্ষেপ কর, পাত্র শূন্য হইল, আর একটী উৎকৃষ্ট সামগ্রী তাহার মধ্যে রাখ, আবার সেই পাত্র পূর্ণ হইল। এইরূপ জানিবে সংসারের প্রতি যোগীর দুই প্রকার ব্যবহার। প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে, দ্বিতীয় পথ ভিতর হইতে বাহিরে। প্রথম পথ কঠিন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে বাহিরের সংসার হইতে অদৃষ্ট অদৃশ্য জগতে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? বাহিরের জগতকেই যথার্থ পদার্থ বলিয়া জানি, তাহা ছাড়িয়া যোগের অনুরোধে কিরূপে অন্ধকারে যাওয়া যায়। বস্তু ছেড়ে অবস্তুতে, আলোক ছেড়ে অন্ধকারে, পরিচিত দেশ ছেড়ে অপরিচিত দেশে যাবে কেমন করে? অনেক লোক ছেড়ে নিজনে যাবে কিরূপে? তারাই বা যেতে দেবে কেন? যদি হঠাৎ চক্ষু মুদ্রিত কর, সংসার ছাড়্‌বে বলে দেখ্‌বে সেই মুদিত নয়নের ভিতরেও সংসার আস্‌বে, কেন না সংসার একটি

বহুকালের পরিচিত বস্তু আর যেখানে যাওয়া হইবে সেখানে ঘোর অন্ধকার। সুতরাং বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া অনুকূল নহে। এই গতি প্রতিকূল স্রোতে। বাল্যকাল হইতে যে সকল সংস্কার, রুচি, রীতি চরিত্র হইয়াছে, তাহার বিপরীত দিকে যাইতে হইবে। যাহাকে বহু কাল সার পদার্থ বলিয়া মান্য করা হইয়াছে, তাহাকে ছায়া, অসার, অপদার্থ জানিয়া, যাহাকে অন্ধকার, শূন্য বলিয়া মনে হইত তাহার মধ্যেই যথার্থ পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। একটি উপায় শাস্ত্রেতে কথিত আছে এবং তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। জড়ের পাত্রটি শূন্য কর, মন্ত্রের বলে জড়ের গুরুত্ব বিলোপ কর। জড়কে যত দিন পদার্থ, সার বস্তু বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, তত দিন সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিবে না। যতই কেন ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বল না, যদি জড়ের অসারতা বুঝিতে না পার, তবে বাহির হইতে ভিতরে গেলেও দেখিবে সেই জড়ের উজ্জ্বলতা এবং গুরুত্ব তোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব যোগশিক্ষার্থী প্রথমেই স্বতন্ত্র জগৎকে ছায়ার মত অসার অপদার্থ বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন। এরই জন্য উপদেশ আছে, যে পরিমাণে বাহিরে অসারতা অনুভব করা হইবে, সেই পরিমাণে ভিতরে বস্তু সৎ এবং সার বলিয়া গৃহীত হইবে। যে পরিমাণে বাহিরের নদী খালি হইবে, সেই পরিমাণে ভিতরের বিশ্বাসনদীতে জল ঢালা হইবে। যাঁহার পক্ষে

বাহিরের জগৎ পূর্ণ, তাঁহার পক্ষে ভিতরের জগৎ শূন্য। যিনি বাহিরে জগৎকে সার বলিয়া জানেন, তিনি অতি কষ্টে ঈশ্বরকে সৎ, সৎ, সৎ, বলিয়া চিন্তা করেন। তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর দর্শন, এবং ঈশ্বরকে ভোগ করা অতি কঠিন ব্যাপার। ঘট থেকে জল ঢেলে ফেল তবে আর আদর থাকিবে না। দেহ থেকে প্রাণ হরণ কর, সেই দেহের আকর্ষণ থাকিবে না। খাঁচা থেকে পাখী উড়াইয়া দাও, সেই খাঁচা আর সুন্দর রহিল না। ফল থেকে শাঁস বাহির করে নেও, খালি খোসার আর আদর থাকবে না। সেইরূপ যোগী যখন বিশ্বাসের হাত দিয়া জড় জগৎ হইতে তাহার গুরুত্ব হরণ করিলেন, তখন এত বড় প্রকাণ্ড জগৎ শূন্য খোসার ন্যায় পড়িয়া রহিল। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, জন্তু, নগর, গ্রাম, সব খোসা, সব অসার। কিন্তু যাহা হারাবে বাহিরে, তাহা পাবে ভিতরে। বাহিরের সব অসার হইল, এ দিকে ভিতরের সব জেগে উঠল। এইরূপে অন্ধকারের ভিতরে বস্তু দেখা ক্রমে হবে, এক দিনে নহে। যাহা বলিলাম তাহা সিদ্ধির অবস্থা। এইটি মনে রাখবে, সাকার আসল বস্তু নহে, নকল বস্তু। যেমন মনে কর, এক জন ধার করে বড় মানুষ হয়েছিল; সোনার মুকুট মাথায়, লোক জন লইয়া মহাসমারোহ করিয়া গাড়ী করিয়া যাইতেছিল; এমন সময় যাহা হইতে ধার লইয়াছিল, সে এসে বিল খানি দেখাইল, তার সোনার মুকুট, গাড়ি

বহুমূল্য অলঙ্কার ইত্যাদি সমুদায় কাড়িয়া লইল, তার আর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। এই গল্প স্পষ্ট জগৎসম্পর্কে সত্য। পৃথিবীর ভাল গান, ভাল দৃশ্য, সমুদায় নিরাকারের কাছ থেকে ধার করা। নিরাকার হইতে ধার করিয়া এই সাকার পৃথিবীর বড় মানুষি। ইহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য বল শক্তি ধার করা। যাঁর ধন তিনি গ্রহণ করিলেন, আর নির্ধন নেড়া জগৎ পড়ে রহিল। এ দিকে সাকারের দারিদ্রতা, দুর্দ্দশা হইল, ও দিকে নিরাকার গিয়ে জেগে উঠ্‌লেন। সাকার গেলেন অসার হয়ে, নিরাকারের নিজের সম্পত্তি ভিতরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এত দিন কেহ জানিত না কিরূপে নিরাকারকে বস্তু করা যায়। হে যোগাশিক্ষার্থী, তুমি বিশ্বাস কর তেমনই বস্তু ভিতরে দেখা যায়, যেমন বাহিরের বস্তু সংসারীরা দেখিতেছে। কেবল ঈশ্বর সম্পর্ক নহে, কিন্তু যে গুলি বাহির হইতে গেল, সমুদায় ভিতরে ধরা যাইবে। শুন নাই কি, পৃথিবীর এক দিকে যদি রাত্রি হয়, অন্য দিকে দিন হয়, আবার ঘুরাইয়া নেও, গোলাকার পৃথিবীতে যে দিকে দিন ছিল, সেই দিকে রাত্রি হইল। সে দিন যেমন গোলাকার পৃথিবীর দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি, যে পথিক পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে চলিতে লাগিল, সে আবার বিমুখ না হইয়া সেই পূর্ব্ব দিকে আসিল। পৃথিবী গোল না হইলে ইহা হইতে পারিত না। এই দৃষ্টান্তে এক দিকে সব অন্ধকার,

আর এক দিকে সূর্য্য। এক দিকে দ্বিপ্রহরা রজনী, অন্য দিকে দ্বিপ্রহর দিবা। সংসারী বলে, বাহিরের এমন দুপরের উজ্জ্বল আলো ছেড়ে কে অন্ধকারে যাবে? যোগী বলেন, ভিতরের এমন বস্তু ছেড়ে কে বাহিরের ছায়া ধরিতে যাবে? যোগীর চক্ষে জগৎ এক খানা প্রকাণ্ড খোসা। প্রকাণ্ড পাথরের পর্ব্বত কাগচের একখানা খেল্‌নার মত। এই জগৎ দেখ্‌তে ঝক্ ঝক্ সোণা, সোণা নয় সোণালি কাগচের মত উপরে মোড়া। ধার করে তারা সৎ, নিজের কিছুই নাই। যথার্থ পদার্থ ভিতরে। এক দুই তিন চার গুণিতে গুণিতে যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনই ভিতরের বস্তু দেখিতে দেখিতে নিরাকারের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে। চর্ম্ম-চক্ষের পক্ষে পৃথিবী যেমন সৎ পদার্থ, ভিতরের চক্ষের পক্ষে তেমনই নিরাকার হইবে। ঘট খালি কর, ঘট পূর্ণ হবে। আজ বাহিরের পাত্রকে খালি করিতে হইবে কেবল এই কথা বলিলাম, ঘট কেমন করে পূর্ণ করিবে তাহা পরে বলিব।

(পুঃ) বাহিরের সমুদয় অসার ভস্মরাশি ইহা জেনে ভিতরে গেলে আর ভয় নাই। বাহিরে ধনরাশি রহিল ইহা জেনে ভিতরে গেলে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়।

সাধন ও করুণার ঐক্য।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই এক গভীর প্রশ্ন, যাহা ভক্তি শিক্ষার্থী হইলে মনে উত্থিত হইবেই। ভক্তি যদি দেবদত্ত অথবা অহৈতুকী হয়, নিয়মের অধীন নহে. তবে সাধনের প্রয়োজন কি? ভক্তির সমুদয় ব্যাপার যদি দৈবাৎ হয়. তবে মানুষের কি রহিল? নামশ্রবণ, নামসাধন, এবং সাধুসঙ্গ ইত্যাদির তবে অর্থ কি? ষোল আনা সাধন করিতেই হইবে. ষোল আনা মূল্য দিতেই হইবে, একটী পয়সা রাখা হইবে না। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বদা বলিতেছেন, সমুদায় দিলেই যে আমি দিব তাহা নহে। দিতে হবেই, যাহা কিছু আছে, শক্তি সামর্থ্য সমুদয় দিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, উপাসনা এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় উপায় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু সমস্ত দিন সাধন করা হইল অথচ এমন হইতে পারে কিছুই ভক্তির উদয় হইল না। ঈশ্বর চান, যে ভক্ত হইবে সে বিনয়ী হইবে, মূল্য দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিবে না, অথচ পাছে অলস হয়, এই জন্য ভক্তকে প্রাণপণে সাধন করিতে হইবে, এই বিধি করিয়াছেন। সাধন করিবে, অথচ অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে, ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরের এই মধুর বিধি। কোন্ দিক্ হইতে. কি উপায়ে ঈশ্বরের বায়ু আসিবে কেহই জানে না, অতএব সকল দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে। সাধনের সমুদয় অঙ্গই

গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, ভক্ত বিনয় এবং ধৈর্য্য শিক্ষা করিবে। সকল অবস্থার মধ্যে তাঁর উপর একান্ত মনে নির্ভর করিয়া থাকিবে। আমাদের দিক্ থেকে সমুদয় দিলাম; কিন্তু তাঁহা হইতে কখন্ প্রসাদ আসিবে জানি না, সুতরাং আশা করিয়া বিনীত ভাবে ধৈর্য্য শিক্ষা করিব। তাঁহার দিক্ হইতে শুভ বায়ু যদি দুদিন না আসে, তাহাতে আমার দিক্ হইতে যাহা দিয়াছিলাম, তাহা ফিরাইয়া লইবার যো নাই। সাধন মূল্য দিতেছি বলিয়া যে উপর হইতে বায়ু পাইতেছি তাহা নহে। তুমি দাঁড় ফেল; কিন্তু দাঁড় ফেলিতেছ বলিয়া যে বায়ু পাইতেছ তাহা নহে। এক দিন একটি ছোট গান গাইয়াছিলে তাহাতেই সমস্ত দিন তোমার হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ ছিল; আর এক দিন অনেক গান করিলে কিন্তু কিছু মাত্র ভক্তির উদয় হইল না। এক দিন কম দিয়ে অনেক পাইলে, আর এক দিন অনেক দিয়াও কিছুই পাইলে না; এ সকল বিষয়ের গাঢ় হেতু কেহ জানে না। কিন্তু একটি পথ আছে, সেই পথে না গেলে ভক্তি বাতাস আসে না, দেবপ্রসাদ পাওয়া যায় না, সেই পথে যাওয়ার নাম সাধন। ভক্তি লাভ করিবার অন্য পথ নাই। সেই পথে গিয়া থাকিতে হইবে, তার পর একটি বায়ু আসিবে, তাহা কোন্ বাগানে লইয়া ফেলিবে কেহ জানে না। তখন সমুদয় কেশাকর্ষণের ব্যাপার হইবে। তোমাকে আর দাঁড়

ফেলিতে হইবে না, সেই বাতাসে নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবে। সেই জায়গা কেহ জানে না। আশ্চর্য্য দেখ, দুই বার চারি বার প্রায় সকলেই সেই জায়গায় গিয়া বসিয়াছে; কিন্তু কেহই তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। স্থলের পথ নহে, জলের পথ, সুতরাং এক শত বার সেই দিক্ দিয়া নৌকা গেলেও পথ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না কোন দিন "প্রেমময়" ইহার প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতে না করিতে প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, আর এক দিন প্রেমময় প্রেমময় সত্তর বার বলিলেও প্রেম হয় না। এক দিন মৃদঙ্গ ধরিবামাত্র ভক্তি উথলিয়া উঠিল, আর এক দিন খুব মৃদঙ্গ বাজাইলে, কিন্তু কিছুতেই ভক্তি হইল না। কিন্তু প্রেম ভক্তি হউক না হউক, যেখান হইতে এক বার প্রেম ভক্তি হইয়াছিল, যেখানে থেকে এক বার ঈশ্বর তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া সাধন করিতেই হইবে। তুমি আমি সর্ব্বদাই অকিঞ্চন হইয়া থাকিব। ফাঁকি দিয়া প্রেমিক হইব এই প্রকার অণুমাত্র আশা করা ভক্তিপথের শত্রু। আমি এত দিয়াছি, অতএব প্রেম এস, এই অহঙ্কারে প্রেম আসিবে না। যে সাধন না করিয়া শুইয়াছিল তাহার পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কাজ করিয়া অহঙ্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনই দরজা বন্ধ। যে খুব সাধন করিয়া বলিল, আমিত কোন মূল্য দিতে পারি না, শুভ ক্ষণে তাহার জন্য ভক্তিদ্বার খুলিল।

সেই শুভ লগ্ন, সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ কাহার জন্য কখন আসিবে তাহা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী জানেন। তুমি ভূমি খনন কর, বীজ বপন কর, কিন্তু বৃষ্টি তোমার হাতে নয়। তুমি পরিশ্রম করিয়াছ বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি আসিবে ঠিক শুভ ক্ষণ হইলেই, যাহাতে বীজ মারা না যায় এমন বৃষ্টি হইবে। যদি বল অনেক দিন পরে বৃষ্টি আসিলে বীজ পচিয়া যাবে, তা হবে না। চাষা না জানিল তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা চাষাকে জানিতে দিবেন না। বৃষ্টি কখনও দুই প্রহর বেলায়, কখনও বা রাত্রে হয়। কখনও হুড়্ হুড়্ করিয়া হয়, কখন হয় না। এই বৃষ্টি হইতেছে, আবার এই কিছুই নাই, এ সকলের হেতু কেহ জানে না। হৃদয়ের ভূমি কর্ষণ পক্ষেও এই রূপ। আমি এত কর্ষণ করিলাম অতএব বৃষ্টি হইবে, এখানে এপ্রকার কার্য্যকারণ নাই। তুমি টাকা দিয়া কিনিতে চাও? ঘুষ দিতেছ? আমি কর্ষণ করিয়াছি বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি হইবেই। দাম দিবে না, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যাহা বলা হবে সমুদয় করিবে। কোন্ দিন কি সূত্রে ভক্তি আসিবে কেহ জানে না। কোন দিন গান করিয়া হইল না, কোন দিন চিন্তা করিয়া হইল না, কোন দিন গানের প্রথম অক্ষর বলিতেই হুড়্ হুড়্ করিয়া প্রেম আসিয়া হৃদয় ভাসাইয়া দিল। কোন দিন সজনে হইল না, নির্জ্জনে হইল। এ সকল পরীক্ষার কথা, হইয়াছে হইবে। ভক্তির

হেতু নাই, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে। ষোল আনা না দিলে পাবে না; কিন্তু দিলেই যে পাবে তাহা নহে। দিলে এই হইবে, যাহারা পাওয়ার অধিকারী তাহাদের মধ্যে গণিত হইবে। সেই পথে চলিতে চলিতে অবশেষে সেই পিচ্ছল জায়গায় গিয়ে পড়িবে, যেখান হইতে সহজে ভক্তির সাগরে ডুবিয়া যাইবে। আমি যাহা করিলাম তাঁহারই আদেশানুসারে, তাঁহারই আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া, তাঁহারই সাহায্যে, কেন না দাঁড় তিনিই করিয়া দিয়াছেন, আর তিনিই হঠাৎ বায়ু পাঠাইলে পাল তুলিয়া দিয়া বসিয়া থাকি। সাধন করিতেও তিনি শিখাইয়া দেন, আর স্বর্গের বৃষ্টিও তিনিই প্রেরণ করেন। দুইয়ের মধ্যে তবে ভেদাভেদ এই যে, একটি দ্বারা তিনি পরামর্শ দিয়া আমাদের দ্বারা করাইয়া লন, আর একটি তিনি আমাদিগকে কিছু না বলিয়া নিজে করেন। যদি ভক্তি আসিতে দেরি হয়, তাহা না আসাতে এত ব্যাকুলতা হয় যে, ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। আমি এমন দুঃখী আমার কাছে তিনি আসিলেন না, এই কথা বলিতে বলিতে তাহার ব্যাকুলতা, বিনয় এবং ভক্তি গাঢ় হইতে থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে নিরাশা মহাশত্রু। ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইবে না, খুব ব্যাকুল হইবে। এত ব্যাকুল হৃদয় যখন, তখন ভক্তি আসিবেই। তবে ভক্তি হওয়াতেও লাভ, না হওয়াতেও লাভ। যখন না আসে তার অর্থ এই যে, অত্যন্ত

আসিবে। অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়াছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তথাপি পড়িয়া আছি। কেঁদে অস্থির হলে তবে প্রেম আসবে। যত ব্যাকুল হবে, তত গাঢ় মাত্রাতে ভক্তি বাড়িবে। তোমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিবে। তুমি বলিবে, এই যে সাতটা বাজিল, কৈ ঠাকুর দেখা দিলেন না, এই দশটা বাজিল, কৈ ঠাকুরত আসিলেন না, এই ছয়টা বাজিল, ঠাকুর কোথায় রহিলেন, তুমি এই রূপে কেবল তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তোমার যাহা করিবার তুমি কর তাঁহার সময়ে তিনি আসিবেন। সাধনের কি কি রীতি প্রণালী পরে বলিব।

বাহিরে আগমন।

হে যোগশিক্ষার্থী, মৃতসঞ্জীবনী শক্তির কথা অবশ্য শুনিয়াছ, মৃতকে আবার প্রাণ দেওয়া যায়, এটী কল্পনা নয় বাস্তবিক ব্যাপার। যখন যোগধর্ম্মশিক্ষার্থ শিষ্য সংসার ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্মশানে একটি মৃত দেহ রাখিয়া গেলেন। এই বাহ্য জগৎ সেই মৃত দেহ। তাঁহার সম্পর্কে এই বিশ্ব মৃত, অসার, অসৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। ভিতরে সারদর্শন, সারচিন্তা, সারের প্রতি অনুধাবন তাঁহার একমাত্র সাধন হইল। এইরূপে বহু বৎসরে বহু চিন্তা দ্বারা, সংসার চিন্তা হইতে নিবৃত্তি, জড় বস্তুর

প্রতি আসক্তি হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া কেবল যাহা নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, সেই বস্তুকে দর্শন, শ্রবণ এবং স্পর্শ করাই তাঁহার কার্য্য হইল। এইরূপে যখন যোগশিক্ষার্থীর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ সমস্ত ভিতরে গেল, তখন অধ্যাপক ছাত্রকে বলিলেন, তুমি এত কাল কঠোর সাধনের পর শাস্ত্রার্দ্ধ পাঠ করিলে, নিরাকারে নিরাকারকে প্রত্যক্ষ দেখিতে শিখিলে; কিন্তু অপরার্দ্ধ এখনও বাকি আছে। পথিক, যে স্থান হইতে আসিয়াছ আবার সেই স্থানে যাও। কুমন্ত্রানুগামী এই স্থানেই বাস করে, সে বলে অসার ছাড়িয়া নিরাকারে প্রবিষ্ট হইয়াছি এই ত যোগ; কিন্তু যাঁহারা সুমন্ত্রের উপাসক তাঁহারা এই অর্দ্ধপথে বসিয়া থাকেন না। তাঁহারা জানেন, আবার পর্য্যটন করিতে হইবে। এই দ্বিতীয় বারে ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে হইবে। এত কাল দ্বার বন্ধ করে সংসার হইতে পলাইয়া, এক প্রকার বন মধ্যে অমিশ্রিত নিরাকার সাধন হয়েছে, এখন সেই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ঘট শূন্য করা, খোসা হইতে শস্য খুলিয়া নেওয়া, ধার করে বড় হয়েছিল যে জগৎ, সেই ধার কেড়ে নেওয়া, দেহ হইতে প্রাণ বাহির করে নেওয়া, সংসারকে শ্মশান করা, ঘর ছেড়ে দেওয়া, প্রথম সাধন। আবার ব্রহ্মরূপ বারি দ্বারা সেই ঘট পূর্ণ করা, ভিতর থেকে সেই নিরেট নিরাকার বস্তুকে এনে, তাহা দ্বারা সেই শূন্য খোসা পূর্ণ করা, আবার কর্জ্জ দিয়া

পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য মহিমা বৃদ্ধি করা, আবার সেই মৃত দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা, আবার গৃহে প্রত্যাগমন করা, যোগের দ্বিতীয় সাধন। প্রথমে যে বস্তু স্পর্শ করা হইত তাহা শীতল, মৃতদেহের উপর হস্ত স্থাপন, কিন্তু যোগশিক্ষার্থী যখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত এবং উত্তপ্ত হইয়া জীবনকে অনুভব করাইয়া দিতে লাগিল। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী তৃণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, জীবন্ত ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্ত্তমান এই তৃণ মধ্যে। প্রথমাবস্থায় সাধকের নিকট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অসার, অসার, অসার, মৃত্যুর ছায়া, অপবিত্র, ঘৃণিত, দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু সার, কেন না প্রত্যেক বস্তু সেই সারাৎসার নিরাকার ঈশ্বরের বাসস্থান। জগতের কোন রূপান্তর বা অবস্থান্তর হয় নাই, কিন্তু যোগীর অন্তরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় বাহির হইতে ভিতরে গিয়া নিরাকার সাধন আবশ্যক, তখন বাহিরের ভয়ানক কোলাহল মধ্যে ব্রহ্মের শব্দ শুনা যায় না; কিন্তু এক বার ভিতরে গিয়া ব্রহ্মের কথা শুনিয়া আসিলে পরে বাহিরের কোলাহল মধ্যেও ঈশ্বরের কথা শুনা যায়। প্রথমে জড়কে অসার, অসৎ বলিয়া ভিতরে চলিয়া যাইতে হয়; কিন্তু ভিতরে নিরাকার বস্তুকে ধারণ করিয়া আসিলে আবার নিজের আত্মা, পরমাত্মা এবং জড় এই তিনই সত্য বলিয়া স্বীকার

করিতে হয়। তখন পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ঈশ্বর একমাত্র পূর্ণ সত্য, তাঁহার অধিষ্ঠানে, জীবাত্মা সত্য এবং জড়ও সত্য। জড় অসার নয়, কখনও অসার হয় নাই, কখনও অসার হইবে না। অসার বলি কখন, যখন আমরা তন্মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতে পাই না। যখন যোগবলে দেখ্‌বে যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তেজস্বী ঈশ্বর বর্ত্তমান, তখন ব্রহ্মাশ্রিত সমুদয় বস্তু ব্রহ্মজীবনে সঞ্জীবিত। তখন চক্ষু কর্ণ খোলা থাকুক সমস্ত দিন, কিছু ভয় নাই। তখন জগৎ স্বচ্ছ, তখন জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর দিয়া যোগীর চক্ষু জগতের কর্ত্তাকে দেখিতেছে, জগৎ আর শত্রু নহে, মিত্র। জগৎ বস্তু কি অবস্তু, প্রকৃত যোগশাস্ত্রে এই প্রশ্নই আসিতে পারে না, জড় আছে কি নাই, সেখানে এ বিবাদ নাই। এ সমুদয় নিষ্পত্তির পর যে উচ্চ ভূমিতে আসা যায়, তাহার উপরে যোগশাস্ত্র নির্ম্মিত হয়। যোগভূমিতে আসিবার পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে, আমি, জড়, এবং ঈশ্বর, এ তিনই সত্য। যোগশাস্ত্রের এই সুন্দর প্রশ্ন, জগৎ স্বচ্ছ না অস্বচ্ছ? প্রত্যেক জড় ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় কি না? প্রথমে মন্দির পরিষ্কার করা হইল, আবার সেই মন্দিরে ব্রহ্মকে স্থাপন করা হইল। এখন তোমার চক্ষু খুলিতে ভয় কি? যে ঘর শূন্য ছিল, তাহার মধ্যে আবার ঠাকুর আসিয়াছেন। বাহিরের জড়াকাশে, ভিতরের সেই চিদা-কাশ; চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, নর

নারী সকলের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাব। স্মরণ রেখো, জড়াকাশে চিদাকাশ, দুই আকাশ এক হয়ে গেল। ইহা কেবল মত নহে, জ্ঞানে জ্ঞানী লক্ষ লোক; কিন্তু যোগে যোগী এক জন। একটি শস্য হাতে নেও, যদি তাহার মধ্যে ব্রহ্মকে না দেখ, শস্যকে অসার, অসৎ বলিয়া ফেলিয়া দাও, সেই শস্যও জঘন্য, তুমিও জঘন্য, দুইই জঘন্য। আবার যোগ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই শস্য হাতে লও, দেখিবে তাহার মধ্যে ব্রহ্ম বসিয়া আছেন, সেই ক্ষুদ্র শস্য ব্রহ্মের মন্দির, সেই শস্যকে গড়াইয়া দাও, ব্রহ্মমন্দির গড়াইয়া যায়। বায়ুকে গাত্র স্পর্শ করিতে দাও, পুষ্পের সৌরভকে তোমার নাসিকাকে আমোদিত করিতে দাও। শরীর যদি আঃ বলে, যোগীর মন তাহার মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শ, এবং ব্রহ্মের সৌরভ পাইয়া কতবার আঃ বলিবে। তাহা নহে, তাহা নহে, তাহা নহে, যোগশিক্ষার্থী, এ শূন্য, শুষ্ক, বিকল জ্ঞান নহে। যেমন এতকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকারে নিরাকারকে দর্শন করিলে, তেমন চক্ষু খুলে সাকারে নিরাকার দর্শন কর। যেখানে একটি জড়ও নাই, সেখানে নিরাকারকে দেখা সহজ, অন্ধকারে অন্ধকার দেখা সুলভ, কিন্তু জ্যোতিতে অন্ধকার দেখাই কঠিন। যোগসাধনের প্রথমাবস্থায় সাধক তৃণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তৃণ! তুমি কে? তৃণ বলিল, আমি তৃণ, তাহা আমি জানি; কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় পরিপক্ক যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তৃণ,

তুমি কে ? তন্মধ্যে ব্রহ্ম বলিলেন, "আমি আছি তৃণ মধ্যে" ! তৃণ কি কথা কহে ? যোগবল এমনই বল, সাকারকে ভেদ করে অতীন্দ্রিয় নিরাকার বস্তু উদ্ভাবন করে। ইহা অদ্বৈতবাদ কিংবা পৌত্তলিকতা নহে। যোগের পথে প্রথমাবস্থায় জড়ের প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি ; কিন্তু পরিপক্কাবস্থায় জড়ের মধ্যে ব্রহ্মের সুনির্ম্মল মধুময় আবির্ভাব। মূঢ়ের কাছে জড়ের নাম স্বপ্রকাশ, ঈশ্বরের নাম অপ্রকাশ। যোগীর নিকটে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, জড় অপ্রকাশ। এই যে যোগের প্রথম গতি এবং শেষ গতি, এই দুয়ের মিল হয়। প্রথমে দেখিয়াছিলে জগতের সমুদয় ঘট শূন্য, এখন দেখিতেছ ব্রহ্মজলরাশিতে সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। যদি বুঝিতে পার, এর ভিতরেও কিছু জড় আছে, বস্তু ছাঁকতে জান, আবার ছাঁকিয়া লও, আবার বাহিরের জগৎকে অসার জেনে ভিতরে যাও। বুঝেছ, যে পর্য্যন্ত ভূলোক, দ্যুলোক, শীত, গ্রীষ্ম, নর নারী সমুদয় বস্তু ব্রহ্মের উদ্বোধক না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভিতরে বাহিরে যাতায়াত কর। যাবতীয় বস্তুতে ব্রহ্মের গাঢ় ঘন আবির্ভাব দেখিতে হইবে। তৃণও বাদ যাবে না, সূর্য্যও বাদ যাবে না ; এক বিন্দু জলও বাদ যাবে না, আবার সমুদ্রও বাদ যাবে না। এইরূপে সমস্ত জগৎ যখন ব্রহ্মের আবাস স্থান হইবে, তখনও যোগ-শিক্ষার শেষ হইবে না, কেন না যোগের উন্নতির শেষ নাই। যোগশিক্ষার্থী, তুমি যোগের আদর্শ পেলে। যোগ কি ;

যোগের পথ কয়টি, যোগের আদর্শ কি, এ সকল জানিলে, অতঃপর যে সকল সাধনে এই আদর্শ লাভ হইবে তাহা কথিত হইবে।

যোগের পথ দুইটি যথা, ১ম বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া; এবং ২য় ভিতর হইতে বাহিরে আসা।

কিন্তু সাধন তিন প্রকার যথা;

১ম জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ,

২য় অন্তরে নিরাকার পরম পদার্থকে অনুভব করা, এবং

৩য় সেই অসার জগতের মধ্যে পুনর্ব্বার সার পরম বস্তুকে বর্ত্তমান দেখা।

স্মৃতি।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, অদ্য সাধনরীতিবিষয়ক প্রসঙ্গ হবে। ভক্তি কি, এবং ভক্তিলাভের জন্য দেব-প্রসাদ এবং মনুষ্যের পরিশ্রম দুইই প্রয়োজন, এ সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে শুনেছ, এখন সাধনপ্রকরণবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর। তুমি কি স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছ? স্মৃতি-শাস্ত্র কি? স্মরণমূলক জ্ঞান। একটু স্থির হও, ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে—"সত্যং শিবং সুন্দরম্" ভক্তির বীজ মন্ত্র। কিন্তু ভক্তির ভূমিতে আসিবার পূর্ব্বেই, সাধক শ্রদ্ধার দ্বারা "সত্যম" কে ধারণ করেন। বাস্তবিক "শিবম্" এই স্বরূপ

হইতেই ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ হয়। শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলময় প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রেম দ্বারা ধারণ করাই ভক্তির আরম্ভ। এই প্রেম দ্বারা যে শিবংকে ধারণ করা ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। শ্রবণ কর, স্মৃতিশাস্ত্র প্রেমতত্ত্বসম্বন্ধে কি বলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময় যখন এই জ্ঞানোদয় হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সাধারণরূপে এবং বিশেষরূপে যে সমুদয় ঘটনাতে তাঁহার দয়ার প্রকাশ দেখিয়াছ, সেই সমস্ত স্মরণ করিতে হইবে। বিধাতা নানা প্রকার সুখদ ও মঙ্গলকর বস্তু সকল সৃজন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা আমাদের ঐহিক ও মানসিক সুখ হইবে, ক্ষুধার সময় অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল, রোগের সময় ঔষধ লাভ করিব। বারংবার এ সকল বিষয় অনুধাবন, ও সমালোচনা করিয়া শিবম্ যে ঈশ্বর তাঁহাকে মনের কাছে প্রতিপন্ন করিবে। প্রথমতঃ সাধারণ রক্ষণপ্রণালী দ্বারা ঈশ্বর জীবের অর্থাৎ তোমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিশেষ ঘটনা দ্বারা তিনি তোমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সে সকল স্মরণ করিবে। আমি অত্যন্ত ভয়ানক দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছিলাম, সেই সময় কেমন অত্যাশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত আমাকে রক্ষা করিল; আমি মরিতেছিলাম, তখন কেমন চমৎকার কার্য্য দ্বারা তিনি আমাকে বাঁচাইলেন, এবংবিধ বিশেষ বিশেষ ঘটনা-বলি স্মরণ করা স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ। জীবনের এই

সকল বিশেষ ঘটনা হয়ত ভুলে গিয়েছ, কিন্তু তাহাদিগকে স্মৃতির পথে আনিতে হইবে। বিস্মৃতি এখানে পাপ, ঈশ্বরের সাধারণ এবং বিশেষ দয়া বিস্মরণ ভক্তিশাস্ত্রমতে অতি দূষণীয় ব্যাপার, অতএব যদি বিস্মৃত হয়ে থাক, বারংবার আলোচনা দ্বারা সে গুলি সমালোচনা কর। জীবনের ইতিবৃত্ত মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা—সেই আমি অসহায় ছিলাম, কে আমার হস্ত ধারণ কর্‌লেন, সেই যখন দুই পথের সন্ধিস্থলে পড়ে কোন্ পথে যাব বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তখন কে জ্ঞান দিলেন, কাহার কৃপাতে সাংসারাসক্তি হতে রক্ষা পেলাম? একা ছিলাম, একাকী ব্রহ্মের দুর্গম পথে চলা অসম্ভব হইত, কোন্ সূত্রে একটি একটি ধর্ম্মবন্ধু এনে দিলেন, কোন্ সূত্রে এই দীক্ষার ব্যাপার হইল, এ সমুদয় ঘটনা স্মরণ করিবে। আমার ঈশ্বর অমুক সময় বিপদভঞ্জন হয়ে আমাকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার কর্‌লেন, অমুক সময় পতিতপাবন হয়ে আমার গূঢ় পাপ হরণ কর্‌লেন, অমুক সময় গুরু হয়ে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এই ভাবে স্মরণ করিবে; বলো না মনে নাই। ভক্তিশিক্ষার্থী যখন হয়েছ তখন মনে রাখ্‌তে হইবে। স্মৃতি শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্র নহে। স্মরণ করে শিখা, শুনে শিখা অপেক্ষা অত্যন্ত উপকারী। ধর্ম্মজীবনের অনেক দুরবস্থা হয় কেবল বিস্মরণ বশতঃ। কি উপায়ে হৃদয়ে প্রেমকে সজীব রাখা যায় ঈশ্বর সেই বিষয়ে

সঙ্কেত বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা ভুলিয়া যাওয়াতে অন্তরের প্রেম শুকাইয়া গেল। তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিলে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখের উদয় হয়। অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় নব জীবনের সঞ্চার হয়। যাহারা স্মৃতি-শাস্ত্রকে লঘু মনে করিয়া তাহার অবমাননা করে তাহাদের অনেক দুর্গতি। বিপদও স্মরণে রাখ্‌বে, উদ্ধারও স্মরণ করিবে. অন্ধকারও স্মরণ কর্‌বে, জ্যোতিও স্মরণ কর্‌বে। যতই স্মরণ করিবে ততই প্রেমে হৃদয় কোমল হইবে, কঠোর চক্ষু বিগলিত হইবে। অনেক লোক, কিছুকাল ধর্ম্মপথে চলিয়াও আবার বিষয়ী, সংসারী এবং অধার্ম্মিক হয় কেবল স্মরণ করে না বলিয়া। স্মরণ কর, সেই ঈশ্বর জননী হইয়া তোমাকে তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া কত বার কত সুধা দিলেন। জ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিতে বলিতেছি না ; সর্ব্ব প্রথমে অতি সহজ কথা এই বলিতেছি, স্মরণ করো ভুলো না। এই শাস্ত্র অতি সামান্য, অতি সহজ। মূঢ় মন, স্মরণ কর। কিন্তু মনুষ্যের কেমন দুর্ব্বুদ্ধি. অতি সহজ বলেই স্মরণশাস্ত্র আদৃত হয় না। মূঢ় অভক্ত অতি সামান্য নিকৃষ্ট শাস্ত্র মনে করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রকে অবহেলা করে। ঈশ্বর কেমন অমুক দিন এই কর্‌লেন, আর এক দিন এই কর্‌লেন, এ সমুদায় স্মরণ কর্‌বে। জীবনের বিশেষ ঘটনা সকল লিখো। ঈশ্বরের দয়ার আশ্চর্য্য ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। দেখাও

ঈশ্বরকে তোমার স্মৃতিশক্তির সৌন্দর্য্য, যিনি সেই শক্তির নির্ম্মাতা। প্রেমময়ের মঙ্গল ঘটনা সকল স্মরণ কর, ভক্তি-রাজ্য স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর। ঐ মাসে কি হইয়াছিল, ঐ বৎসর কি হইয়াছিল, এই রূপে ক্রমাগত একটির পর আর একটি স্মরণে আসিবে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সকল ঘটনা, যাহাতে ঈশ্বরের দয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে অতি আদরের সহিত সেই সকল লিপিবদ্ধ করিবে। আজ এই স্মৃতিশাস্ত্র বলা হইল, দ্বিতীয় বিভাগ দর্শনশাস্ত্র পরে বর্ণিত হইবে।

বৈরাগ্য।

হে যোগশিক্ষার্থী, এক বার সংসার ছাড়িতেই হইবে। সংসারে থাকিয়া যদি যোগী হইবে, সংসার ছাড়িয়া যোগ শিক্ষা করিতে হইবে। যোগীর যে প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া যাওয়া এইটির নাম বৈরাগ্য। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী যে অন্তরের মধ্যে সেই নিরাকার ঈশ্বকে দর্শন, শ্রবণ এবং সম্ভোগ করেন, তাহার নাম নিরাকার সাধন। তৃতীয় অবস্থায় সেই নিরাকারকে বহির্জগতে প্রতিষ্ঠা করা, তাহার নাম সাকারে নিরাকার সাধন। প্রথম বৈরাগ্যকে বন গমন অথবা মনোগমন বলা যায়। প্রকৃত যোগীর পক্ষে মনোগমনই যথার্থ কথা। বন কি? যেখানে

সংসার নাই, সংসারের অতীত, সংসার হইতে বহু দূরে যে স্থান তাহাই বন; সেই স্থান বাহ্য বন নহে মনে। সংসারী বিষয়ীরা সেখানে যাইতে পারে না। ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি লইয়া প্রিয় সংসারকে অসার বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে দিন আরম্ভ হয় সেই দিন সন্ন্যাসাশ্রম, বৈরাগ্যজীবন, অথবা যোগশাস্ত্রপাঠের প্রথম পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। অসার স্থানে থাকিব না, অসার খাওয়া খাইব না, অসার সুখ ভোগ করিব না, সার জগতে যাব, সার বস্তু দেখিব, সার পদার্থ ভোগ করিব, এই সংকল্পে বৈরাগ্যের আরম্ভ হয়। যোগগৃহে প্রবেশ করিবার দ্বার বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই প্রকার। এক জ্ঞানগর্ভ, এক ভাবগর্ভ। কে সন্ন্যাসী হইল, বনে যায় কে; আধ্যাত্মিক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে কে? তার নাম কি? ধর তাহাকে। দেখিবে দুই জন। কিন্তু দুই জনে আবার এক জন। এক মন, আর এক হৃদয়; এক বুদ্ধি, এক ভাব; এক সংস্কার, এক অনাসক্তি; এক অসারজ্ঞান, এক তিক্ত জ্ঞান। যে লোক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে তাহার এক বুদ্ধি এক ভাব। অর্থাৎ বৈরাগী দুই প্রকার। জ্ঞানবৈরাগী এবং ভাববৈরাগী। জ্ঞান বৈরাগী কে? যিনি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন, এ সংসার অসার। এ সোণা নহে গিল্টি করা। এই যে পৃথিবীর মান সম্পদ সমুদয় গিল্টি। বুদ্ধিবন্ধু অনু-

সন্ধান এবং আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে এই সংসারে যত কিছু দেখিতেছি সকলই অসার জিনিষ। একটি উৎকৃষ্ট কষ্টি পাথর আছে বুদ্ধির হাতে, তার নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কেহ সঙ্গে যায় না। যাই দেহ ত্যাগ, অমনই সর্ব্বত্যাগ। সেই কষ্টি পাথরে জগৎকে ঘষ, জানতে পারিবে, এ সংসার অসার গিল্টি। বৈরাগ্যজ্ঞান জানিতে পারিবে এই যে, সংসারের এত সুখ এ কিছুই নহ। এইত মায়া প্রবঞ্চনা, মৃত্যু হইলেই ত এরা তোমাকে ছাড়িয়া দেয়। একটি প্রশ্নের দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে। মৃত্যুর পর তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না? সংসার বলিবে, না। তুমি বলিবে সংসার তবে তুমি আমার নহ। সংসারের বাহিরে এত চাকচিক্য; কিন্তু ভিতরে ভুয়ো। এক কষ্টি পাথর চক্ষু নিমীলিত করা। চক্ষু বুজিলেতো কিছুই কিছু নহে। এত যে টাকা এত যে মান সম্ভ্রম, কিছুই নহে। আর এক কষ্টি পাথর মৃত্যু। মৃত্যুচিন্তাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কিছুই কিছু নহে। এইরূপে সাধক, তুমি বুদ্ধিগত বৈরাগ্য সাধন কর। কোথায় বসিয়া আছি, ছায়ার উপরে? কি দেখিতেছি? কি করিতেছি? ছায়া, সকলই ছায়া। সকলই অসার। এখন ঈশ্বরকে ইহার মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে না, অসার সংসার খোসার ন্যায় পড়িয়া আছে, সংসার এই আছে এই নাই। জ্ঞানগত বৈরাগ্য নিশ্চিত

বৈরাগ্য ; কিন্তু কিছু কঠোর, কেবলই বুদ্ধি জ্ঞান, চিন্তা দ্বারা জানিতে হয় এই সংসারে পরমার্থ নাই, সকলই অপদার্থ। দ্বিতীয় বৈরাগ্য কি ? ভাবগত বৈরাগ্য। হৃদয়ে বৈরাগ্য হবে কিরূপে ? মন বলিল, ওরে সংসারে যে সকল দেখিতেছ, এরা সব অসার, প্রবঞ্চনা, মায়া ; হৃদয় বলিল যাহা হউক, আমার ভাল লাগ্‌ছে না, এ সব তিক্ত। মন্ বল্‌লে, এরা যত ক্ষণ থাকে, কেবল জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। সুতরাং মন এবং হৃদয়, বুদ্ধি এবং ভাব দুইই সংসার ছাড়িয়া বাহির হইল। সুমিষ্টরসস্পৃহা হৃদয়ের পক্ষে স্বাভাবিক, সে তিক্ত রস পান করিয়া কেমন করিয়া চরিতার্থ হইবে ? অসার সংসারে অনেক ধন মান সম্ভ্রম প্রচুররূপে উপার্জ্জিত হইল ; কিন্তু উদর খেয়ে খেয়ে, ভোগ করে করে বল্‌লে ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা আর তার পক্ষে সুখ হল না। তুমি যদি বৈরাগ্য সাধন কর, দেখিবে দুইই হইল কি না ? জ্ঞানগত বৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত সহজ, ভাবগত বৈরাগ্য সকলের হয় না। এই সংসার অসার অতএব ইহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত। ভাববৈরাগী, ভাবসন্ন্যাসী যাঁরা, তাঁরা "এই" "অতএব" গ্রাহ্য করেন না। উচিত বোধে ভাল জিনিষ না খাওয়া, আর ভাল জিনিষে রুচি না থাকা এ দুই স্বতন্ত্র। অধিক টাকা উপার্জ্জনে কি ফল, এই প্রকার উচিত মনে করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে না ; কিন্তু অনেক টাকা পেলে কি

তোমার বিতৃষ্ণা হয়? আজ তুমি পর্ণকুটীরবাসী; কিন্তু কাল যদি অট্টালিকা পাও তাহাতে কি তোমার আসক্তি হবে না? ভাববৈরাগীকে সংসারের সুখ কামড়ায়, দংশন করে, বিষের ন্যায় জ্বালাতন করে। এই বৈরাগ্য এখনও বহু দূর। সুখে সুখী নয়, সুখের সংস্পর্শে জ্বালা। খুব ভাল খাওয়া ভাল পরা, সংসারের উচ্চ অবস্থা সূচের ন্যায় তাঁহাকে বিদ্ধ করে। সুখের জ্বালায় অস্থির হইয়া মন আপনি বনের দিকে গমন করে। এই যে হৃদয়ের ভিতরে সুখের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা, অনাসক্তি, এই ভাব প্রকৃত বৈরাগ্য মধ্যে অবশ্য স্থান পায়। জ্ঞানবৈরাগ্য বলিয়া দিল, ছায়া ছাড়, মায়া ছাড়; আর হৃদয়বৈরাগ্য বল্‌ছে, এই মায়া! মায়া দংশন কর্‌ছে, সূচের মত বিদ্ধ কর্‌ছে, গেলাম রে মলাম রে। খুব ভাল খাদ্য নিকটে প্রস্তুত, খুব ভাল পরিচ্ছদ নিকটে উপস্থিত, হৃদয়বৈরাগী বলিল, যন্ত্রণা, জ্বালা এয়েছে, ভাল খাদ্য, ভাল পরিচ্ছদের বেশ ধরে? সাধনের প্রথম পরিচ্ছেদ এই বনে গমন অরণ্যে বাস নহে, হৃদয়কাননের ভিতর কিছু কাল সাধন করা। এর পক্ষে সহায় জ্ঞানবৈরাগ্য এবং হৃদয়বৈরাগ্য।

সংসারে যে পুনরায় আসার কথা হয়েছিল তাহাও এই বৈরাগ্যের সঙ্গে মিলিবে। ভিতর হইতে উন্নত বৈরাগী হইয়া আসিয়া কেমন করিয়া সংসারে কার্য্য করা যায় তাহা পরে শুনিবে।

এখন এই দুইটি সাধন করবে সংসারের সুখকে যাতে অসার জ্ঞান হয়, আর যাতে ভাল না লাগে। যদি ভাল জায়গায় থাক্‌তে হয়, ভাল খাদ্য খেতে হয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিবে।

দর্শন।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, প্রেম তত্ত্বের দুই বিভাগ ইতিপূর্ব্বে শ্রুত হয়েছে। শিবম্ যিনি তাঁহাকে প্রেম দিতে হয়। শিবপ্রেম ভক্তির প্রথমাবস্থা। মুগ্ধ হওয়া পরিপক্কাবস্থা। সেই যে শিবম্ তৎসম্বন্ধে দুই শাস্ত্র, এক স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। যে সকল দয়াব্যঞ্জক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করিয়াছেন, সে সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সমুদয় পাঠ করিলে কৃতজ্ঞতা, প্রেম, এবং ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সে সকল ঘটনা যত বিস্মৃত হবে, তত তোমার প্রেম, কৃতজ্ঞতা দুর্ব্বল হবে। সে সমস্ত পুনরাবৃত্তি অথবা বারংবার স্মরণ করিতে করিতে প্রেম বীজ অঙ্কুরিত হয়। ভক্তি শিক্ষার্থী, তুমি মানুষকে কখন ভাল বেসেছ? তাহা হইলে শিবের প্রতি কিরূপে প্রেম স্থাপিত করিবে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা সহজে লাভ করিতে পারিবে। দুয়েরই নিয়মের সাদৃশ্য আছে। কাহার কতক-গুলি হিতকর কার্য্য দ্বারা উপকৃত হইবার পূর্ব্বে, কোন

মানুষকে তুমি কখনই ভাল বাস নাই। এক দিন তোমার ঘরে অন্ন ছিল না, সে ব্যক্তি অন্ন দিলেন, অন্যদিন বস্ত্র ছিল না, তিনি বস্ত্র দিলেন, আর এক দিন রোগে কাতর হইয়াছিলে তিনি ঔষধ দিলেন, অপর এক দিবস, শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া সান্ত্বনাহীন অধীর হইয়াছিলে, তিনি আসিয়া বন্ধুভাবে তোমার হিতসাধন করিলেন, এই চারিটি দয়ার কার্য্য বারংবার ক্রমাগত স্মরণ করে তাঁহার প্রতি তোমার মনে ভালবাসা হইল। যত বার সেই সকল কথা স্মরণ হয় তত বার তোমার কৃতজ্ঞতা প্রেম উজ্জ্বলতর হয়। কিন্তু যে কাজ, সেই কি মানুষ? সমস্ত কায্য উৎপন্ন হয়েছে যে লোক থেকে সেই লোকের উপরেই ভালবাসা যায়। এক ব্যক্তি তোমার অজ্ঞাত এবং তোমা হইতে দূরে থাকিয়া তোমার উপকার করিলেন, সেই দূরস্থ অলক্ষিত ব্যক্তির প্রতিও প্রেম হয়। উপকৃত হলেই উপকারী বন্ধুকে ভালবাসা দিতে পার। কার্য্য হইতে প্রেম সমুদিত হয়, কার্য্যকারী বক্তিতে তাহা নিবদ্ধ হয়। কাজেতে জন্ম হল, বসল কিন্তু সেই লোকেতে। কেন হল? মনোবিজ্ঞানের নিয়মে। ভালবাসাই ভালবাসাকে জন্মায়। হাত ভাল বাসে না, কাজগুলি একটি ভাবের বাহ্য নিদর্শন। আমাদের ভালবাসা, সেই কাজে প্রকাশিত ভালবাসার উৎস যেখানে সেখানেই যায়। যেখানে দেখি ভালবাসার সহিত কাজ করা হয়েছে, সেখানেই প্রেমের উদয় হয়। একটি

ব্যক্তিতে সেই ভালবাসা আছে জেনে তাঁহাকেই ভালবাসা দেওয়া হয়। সেই লোকটির কাছে অমুক দিন এই উপকার পেয়েছি, অমুক দিন এই উপকার পেয়েছি, অমুক অবস্থায় এই উপকার পেয়েছি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার প্রতি প্রেম হয় (যদি মানুষকে ভাল বেসে থাক ইহার সাক্ষী হতে পারবে)। যখন এক বার তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখিলে আর যদি তিনি কাজ নাও করেন; তথাপি তাঁহাকে ভাল বাসিবে। যদি আরও কাজ করেন, আরও ভালবাসা বাড়্‌তে পারে; কিন্তু যে ভালবাসা হয়েছে তাহার আর বিনাশ নাই। তিনি কাজ করুন না করুন তাঁহাকে কাছে দেখ্‌লেই তোমরা প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত প্রেমের আনন্দ হইবে; আগে কাজের প্রমাণেতে যখন তাঁহার প্রতি প্রেম নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি যে তোমাকে ভাল বাসেন তাহার আর অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই। এইটি সংলগ্ন কর ঈশ্বরেতে। ঈশ্বর কেন আকাশে চন্দ্র সৃজন করিলেন? কেন পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিলেন? কেন পর্ব্বত, সমুদ্র রচনা করিলেন? কেন পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব দিলেন? যিনিই হউন, যোগী হউন, ঋষি হউন, ভক্ত হউন, প্রথমে এ সকল প্রশ্ন করিয়া, দয়ার এ সকল বাহ্য ক্রিয়া দেখে ঈশ্বরের দয়া সাব্যস্ত করিতে হয়। আকাশে, জলে, স্থলে, জীবনে, বন্ধুতায়, এ সকল দয়ার লক্ষণ দেখিয়া বিশ্বাসী ভক্ত বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বর

আমাকে ভাল বাসেন। এ সকল ঘটনা সঞ্চয় করে কি স্থির হল? যিনি এতগুলি ব্যাপার করেছেন তিনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত প্রেমিক। এই সমুদয় প্রমাণ নিয়ে যখন স্থির সিদ্ধান্ত হল, যিনি এই জগতের স্রষ্টা আমার প্রতি তাঁহার প্রেম আছে, তখন সহজেই আমার ভালবাসা তাঁহাতে গিয়ে পড়ে, আর কাজ দেখ্‌তে হয় না। তখন আর স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা তাঁহার দয়া আলোচনা করিতে হয় না, তখন দর্শন আরম্ভ হয়। আর 'অতএব' প্রাণালী দিয়া ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিতে হয় না, এখন মন নিশ্চয় জানিয়াছে যে তিনি দয়াময়। এখন দয়ার ঠাকুর কাছে এলেই হইল। তার পর, জগৎপতি, জগৎপিতা ভক্তের কাছে এলেন। এ সমুদায়ত ইনি করেছেন? ইনিইত বিপদ দেখ্‌লে উদ্ধার করেন? এই বল্‌তে বল্‌তে অমনি প্রাণ বল্‌লে, নাথ, তুমি অত্যন্ত প্রেমময়, তুমিই শিব। এত দিন স্মৃতিশাস্ত্রমতে 'শিবম্‌' তিনি এই তৃতীয়ব্যক্তিবাচক ছিলেন, এবং চিন্তা ও স্মরণের বস্তু ছিলেন, এখন দর্শনশাস্ত্র মতে, শিবম্‌ দ্বিতীয়ব্যক্তিবাচক নিকটস্থ তুমি হইলেন। দর্শনের সময়, ভক্ত তাঁহার অন্য কোন দয়ার কার্য্য দেখিতে চায় না, তাঁহার আর কিছুরই দরকার হয় না, তিনি বলেন আমি কেবল তোমার দর্শন চাই। যিনি আগে এত দয়ার কার্য্য করিতেছেন সেই ব্যক্তিকে এখন অকা-

রণে ভালবাসা, দর্শনের আরম্ভ। পূর্ব্বে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে ইনি আমাকে ভাল বাসেন, সেই প্রমাণিত দয়ার জন্য এই উপস্থিত ব্যক্তিকে ভালবাসা। দর্শনশাস্ত্রে প্রেম কি? কেবল দেখিবামাত্র প্রেমের উচ্ছ্বাস। সেই তিনি আমার সাম্‌নে এসেছেন, এই বল্‌তে না বল্‌তেই প্রেমে মূর্চ্ছা। তিনি কবে কি করেছেন ভাব্‌তে হয় না, চিন্তা করে প্রীতি দেওয়া স্মৃতিশাস্ত্র, দেখে প্রেম দেওয়া দর্শন শাস্ত্র। পৃথিবীতে যেমন মায়ের প্রতি ভক্তি হওয়ার পর মাকে দেখ্‌লেই মন পবিত্র ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বর কেবল ভক্তের সমক্ষে এসে বসেছেন, আর ভক্ত ক্রমাগত দেখ্‌ছেন আর ভাল বাসছেন। কেবল দেখা, আর কোন প্রমাণ নাই। সেই মুখের ভাব ভঙ্গীতে প্রেমের লক্ষণগুলি ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ভক্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। শিশু কালে দেখ্‌লাম মার হাতটি নড়িল, আর ভাত মুখে তুলে দিলেন, এই জন্য মাকে ভক্তি দিলাম; কিন্তু তার পর মা মুখে ভাত তুলিয়া না দিলেও কেবল তাঁহাকে দেখিলে ভাল বাসিতে লাগিলাম। সেইরূপ যখন ঈশ্বর দর্শন লাভ হইল, তখন এতগুলি দয়ার কাজ, অথবা অনন্তকাল দয়ার কাজ দেখিলে যে প্রেম হবে, কেবল এক বার সেই প্রেমমুখ দেখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রেম হবে। সেই প্রেমমুখের ভিতরে সেই প্রেমনয়নের মধ্যে, যখন দৃষ্টি প্রবেশ করিল তখন

কেবল এক বার দেখা আর প্রেমে মোহিত হওয়া, কাজের জন্য অপেক্ষা কর্‌তে হয় না। যখনই তাকাইলে, তখনই প্রেম। কাজ হল প্রেমের প্রকাশ, যাহা স্মৃতিশাস্ত্রের অবলম্বন। দর্শনশাস্ত্রে প্রেমের কাজ নহে; কিন্তু প্রেমই দেখ্‌চ, যিনি কাজ করেন, তাঁহাকেই দেখ্‌চ। এই দর্শনটি সাধন কর্‌তে হবে। যখন প্রাণ শুষ্ক হবে তৎক্ষাণাৎ অন্তরে এক বার প্রেমনয়নে সেই প্রেমময়ের প্রতি দৃষ্টি কর্‌বে, এই দর্শন সমস্ত মরুভূমিকে প্রেমে প্লাবিত করিবে। এই দর্শনের সময় ঈশ্বরকে ভক্ত বলেন, তুমি বস, আর আমি বসি, তুমি তাকাও আর আমি তাকাই। তাঁহার দৃষ্টি আমার দৃষ্টির উপরে, আমার দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টির উপরে। খুব ঠাওরে দেখ্‌বে। যথার্থই এই মুখে প্রেম আছে, এই চক্ষে প্রেম আছে। আমাকে পাপী জেনেও, এমন করে আমার প্রতি দিন রাত তাকাইয়া আছেন। স্নেহভরে চেয়েই আছেন, তবে আমি আরও তাঁহাকে দেখি আর ঐ নয়ন দেখি। এইভাবে বারংবার দেখিতে দেখিতে প্রাণ মন একেবারে প্রেমে বিগলিত হইয়া যাইবে।

বৈরাগ্য।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্য শিক্ষা কর। প্রকৃতরূপে বৈরাগ্য শিক্ষা না করিয়া যদি ভিতরে যাও আবার সংসারে

প্রত্যাগমন অনিবার্য্য। এখানকার বিষয়সকল সংযত করিয়া না গেলে আবার ইহারা তোমাকে সংসারে টানিয়া আনিবে। সোলা কি জান। ইহার অত্যন্ত বড় এক খণ্ড নিয়ে অনেক দূর জলের নীচে যাও, সেই সামগ্রী এত হাল্কা যে তাহা ভাসিয়া উঠিবে। মনকে সেই রূপ তুমি ভিতরে মগ্ন কর, যদি লঘুত্ব থাকে আবার ইহা ভাসিয়া উঠিবে। সংসারী বিষয়ী মন এত লঘু যে যত বার ইহাকে ভিতরে লইয়া যাইবে, তত বার ইহা আবার ভাসিয়া উঠিবে। গরু বাঁধা আছে দড়ীতে, সেই গরু কি ঘুর্‌তে পারে না, দৌড়িতে পারে না? ঘুরে, দৌড়ে, অথচ একটী সীমার ঐদিকে বেরোতে পারে না। মনরূপ গরুকে সংসার বেঁধেছে, কিন্তু ভ্রান্তচিত্ত লোক মনে করে, আমিত নিজের ইচ্ছামত দৌড়িতে পারি, অথচ একটু ধর্ম্মের প্রগাঢ়তা যদি হয় অমনি জান্‌তে পারে যে একটী সীমার মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে। এই জন্য বাহিরের রজ্জু কাট, যদি ভিতরে অনেক দূর যাবে। বৈরাগ্য নিতান্ত আবশ্যক। তোমার রাজ্য যদি সুশাসিত না হয়, ইন্দ্রিয়সকল যদি দমন না কর, সংসার যদি জিত না হয়, এ সকল দুর্জ্জয় রিপু তোমাকে আক্রমণ কর্‌বেই; তুমি ভিতরে স্থির হয়ে শান্তি ভোগ করিতে পারিবে না। আগে এ সকল বিদ্রোহী প্রজাদিগকে জয় করিয়া পরে ভিতরে গিয়ে সাধন কর্‌বে। বুদ্ধিগত যে বৈরাগ্য তাহাও বিশেষরূপে সাধন কর। চক্ষু

নিমীলনরূপ কষ্টিপাথরের দ্বারা সংসারকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাকাও আর চক্ষু নিমীলিত কর, বল এই আছে, এই নাই, বার বার বল সেই বস্তু আছে আর নাই, ভেল্কী, যাদু। বস্তুভেদী জ্ঞান এক প্রকার আছে, উহা বস্তু ভেদ করে ভিতরে যায়। স্থূলদর্শী জ্ঞান বাহিরে বেড়ায়। তোমার জ্ঞান সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী হউক। তোমার জ্ঞান বস্তুর ভিতরে ব্রহ্মকে দেখুক। তীব্র জ্ঞানদৃষ্টিতে সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, অগ্নির অগ্নিত্ব দেখিয়া বাহ্য বস্তুর অসারতা প্রতিপন্ন করিবে। এই বিষয়ে ক্রমোন্নতি বিশ্বাস করিবে, এক দিনে হয় না। যেমন ব্রহ্মদর্শন ক্রমাগত উজ্জ্বলতর হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ সাধন দ্বারা জগতের অসারতা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারিবে। সহস্র লোক বল্‌বে জগৎ অসার; কিন্তু সহস্রের মধ্যে হয়ত এক জন লোকে দেখে জগৎ অসার। তুমি অসার দেখ্‌তে চেষ্টা কর। বুদ্ধিগত বৈরাগ্য দ্বারা এমনি নিশ্চিতরূপে জগৎকে অসার শ্মশান বলিয়া চলিয়া যাও যে, আর যেন এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয়, এবং হৃদয়গত বৈরাগ্য দ্বারা সংসারের প্রতি অনুরাগবিহীন হও এবং অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব কর। প্রথমতঃ ধনে, মানে, আহারে, পরিচ্ছদে, কোন্ কোন্ স্থানে আসক্ত আছ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহা দূর কর। যে সকল বস্তুতে অত্যন্ত সুখ বোধ হয়, সেই সুখের লোভ পরিত্যাগ কর। এই হৃদ্গত

বৈরাগ্য সাধনের সময় একটি বিষয়ে মনোযোগ রাখিবে। অপক্কাবস্থায় উদারতা উচিত নহে। যেখানে সেখানে থাকি না কেন, যাহা তাহা খাই না কেন, যাহা তাহা পরি না কেন, কিছুতেই আমার যোগভঙ্গ হইবে না, প্রথমাবস্থায় কদাচ এই উদারতা উচিত নহে। আবার চির কালই যে, এখানে থাকিব না, ঐ দ্রব্য খাব না, ঐ বস্ত্র পরিব না, ইহা করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ এই এই দ্রব্য খাইব, এই এই স্থানে থাকিব, এই এই লোকের সঙ্গ করিব, এ সকল নিয়ম আবশ্যক; কিন্তু চির জীবন কঠোর তপস্যা রজ্জুতে বদ্ধ থাকা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। প্রকৃত বৈরাগ্য এক বার কঠোর সংযম দ্বারা সংসার বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া পরে ব্রহ্মের আদেশে, (সুখের ইচ্ছাতে নহে) সংসারের কর্ত্তব্যসকল পালন করে। প্রথমাবস্থায় দুঃখ তোমার গুরু, সুখ তোমার শত্রু। দুঃখ তোমার স্বর্গ, সুখ তোমার নরক; এই মূল নিয়মটি হৃদয়ে লিখে রাখ। লোভের বস্তু সমুদয় পরাজয় কর। খুব ভাল খাওয়ায় কাজ কি? খুব ভাল শয্যায় শোয়া কাজ কি? মান, অপমান কিছু নাই। এগুলি হবে অনেক বৎসর সাধনের পর। যাহাতে সুখ হয় তাতে তিক্তরস মিশ্রিত কর। সে ক্ষমতা ঈশ্বর দেন যাতে সংসারের সুধার সঙ্গে তিক্তরস মিশ্রিত করা যায়। ধন মানের প্রতি বিতৃষ্ণা চাই। না ভাল আহার হইল অসন্তোষ নাই, না ভাল বস্ত্র হইল, না ভাল শয্যা হইল,

অসন্তোষ নাই। বৈরাগ্যের বিশেষ সাধন এই, লোকে যাতে বৈরাগ্যের ব্যাপার খুব কম দেখ্‌তে পায়। দৃষ্ট বাহ্য বৈরাগ্য অপেক্ষা অদৃষ্ট আন্তরিক বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ, তুমি এই শেষোক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ কর। সেই বিতৃষ্ণাটী আন্‌বে, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, আমি পালায়ে ভিতরে যাই। এদের যন্ত্রণায় জ্বলে এমনি হবে যে, ভিতরে না গিয়া আর বাহিরে থাকিতে পারিবে না। যদি অধিক কথাতে সুখ হয়, অল্প কথা বল, যদি অধিক খাওয়াতে সুখ হয়, অল্প আহার কর, এই সমুদয়ের মধ্যে মূল নিয়ম একটি এই যে কিছুতেই মৃত্যু রোগকে আনয়ন করা হবে না। সাধনের দোষে যাহারা রোগগ্রস্ত বা মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় তাহারা বৈরাগ্যের মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রকৃত বৈরাগ্যে শুষ্কতা এবং বিকট ভাব নাই। ইহা শান্তি আর কান্তি। বৈরাগ্য সুন্দর, বৈরাগ্য শান্ত। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার তবে দুঃখ নেব কেন? দুঃখ নেবে না; কিন্তু দুঃখকে সুখ করে নেবে। সংসারের সুখকে জ্বালায়ে তাহা হইতে খাদ বাহির করে নেবে। বৈরাগ্য কড়াতে সংসারের সুখকে জ্বালাইলে তাহা হইতে ইহার অপকৃষ্ট অংশ বাহির হইয়া যাইবে, পরে যাহা থাকিবে খাঁটি শান্তি। বৈরাগ্যের শেষাবস্থায় তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা দুই গিয়ে শান্তি আস্‌বে। ইচ্ছা করে এমন কষ্ট নেবে না যাতে রোগ আসে। যদি নেও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হবে। যদি অসময়ে আহার করিলে

রোগ হয়, তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা জীবননাশ, বৈরাগ্যের মূল মন্ত্রের উচ্ছেদ।

অশ্রু।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, প্রকৃত ভক্তি তবে শিব উপাসনাতে। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার দয়া স্মরণ করিয়া এবং দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে যে ভাব হয় তাহার নাম ভক্তি। এই হইল শিবম্ মঙ্গলময়ের পূজা। এই যে প্রেম, এই যে মঙ্গল ভাব, এই ভাব ঘনীভূত হইয়া আছে সেই ব্যক্তিতে। সেই মঙ্গলময় ব্যক্তিকে দর্শন করিলে তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য আর তাঁহার মঙ্গল কার্য্য স্মরণ করা আবশ্যক হয় না। কাজের ভাব কমে যাবে, গুণের ভাব বৃদ্ধি হবে সেই ব্যক্তিতে। তিনি কখন কি করিতেছেন তাহা দার্শনিক প্রেম দেখ্‌বে না। কোন কার্য্যই ভাব্‌তে হয় না কেবল তাঁহাকে দেখ্‌লেই এই প্রেমের উদয় হয়। স্মৃতি দ্বারা প্রেম উদ্দীপন করা নীচ অধিকারীর কার্য্য। আমি ভাল বাস্‌ব না? আমাকে যে খাওয়ালেন, বাড়ী দিলেন, ধর্ম্ম দিলেন, দর্শনশাস্ত্র এ সকল হেতু অপেক্ষা করিয়া প্রণয় স্থাপন করে না। উচ্চাধিকার যখন হইল, তখন ভক্ত বলেন আমি ভাল না বেসে থাকব কেমন করে। এই অবস্থায় কেবল দর্শন মাত্রই প্রেম

হয়। এই যে দেখ্‌বামাত্র একটি ভাব হয় তাহা শরীর মনকে অধিকার করে। সেই লক্ষণ দ্বারা সেই ফল দ্বারা জানা যায় যে অন্তরে দর্শনজনিত প্রেমের উদয় হইয়াছে। যখন সেই অত্যন্ত ভাল ঈশ্বরের প্রেমময় বদন দর্শন হয়, তখন নিশ্চয় যিনি দেখেন তাঁহার শরীর মনের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কবে তিনি কি করেছেন তাহা ভাবতে হয় না, দেখিবামাত্রই শরীর মন কেমন এক প্রকার হইয়া যায়। অনুরাগের সহিত চন্দ্র দেখ্‌ছ; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করিয়া কি চন্দ্রকে ভালবাস যে, ইহার জ্যোৎস্নায় আমার আনন্দ হয়? না। উপকার ভেবে নয়, দর্শনেই প্রেম হয়। তুমি পাঁচটি কি দশটি উপকার করেছ অতএব উপযুক্ত পরিমাণে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম গ্রহণ কর, যেখানে সাক্ষাৎ দর্শন হয়, সেখানে আর এই বিনিময়তত্ত্ব নাই। ভালবাসা দেখ্‌লেই ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা হয়। ভালবাসা একটি অতি সুস্নিগ্ধ এবং সুকোমল জিনিষ। চন্দ্র দেখ্‌লে কি হয়? সমস্ত শরীর মনের উপর শান্তিরূপ একটি জ্যোৎস্না আসে, গা কেমন করে এল, প্রাণ কেমন করে এল, একটি প্রশান্ত শীতল ভাব হল, বাক্য সকল সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। পূর্ণিমার চন্দ্রদর্শনে অঙ্গ শীতল হল, প্রাণ স্নিগ্ধ হল, কিন্তু সেই সুস্নিগ্ধ ভাব যে কি তাহা কিরূপে বাক্যে প্রকাশ করিবে? জ্যোৎস্না আপনার গুণে যে বস্তুর উপরে পড়ে তাকে শীতল করে। তেমনি

আমাদের গুণে নহে, আমাদের চিন্তা কিংবা স্মরণের গুণে নহে, কিন্তু প্রেমময় ঈশ্বর যখনই অন্তরে প্রকাশিত হন, তখনই প্রেমের উদয় হয়. তখনই অন্তরে একটি সুস্নিগ্ধ মধুময় ভাবের উদয় হয়। প্রেমিক ব্যক্তি সদা স্নিগ্ধ। একটি অপূর্ব্ব শান্তিরস এসে তাঁহার সমস্ত প্রাণকে অভিষিক্ত করে। সুশীতল জ্যোৎস্নার ন্যায় ক্রমাগত ভক্তের চক্ষুর ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেমরশ্মি আসিয়া তাঁহাকে স্নিগ্ধ করে। যদি কোন দিন এই প্রকার না হয় সেই সেই দিনকার প্রেম স্মৃতিশাস্ত্রের হতে পারে, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের নহে। এই যে স্নিগ্ধ ভাব আরম্ভ হয়, ইহাতে কঠোর ভাব নরম হয়। চোক স্পন্দহীন এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কঠোর চক্ষু আর্দ্র হয় আর্থৎ ভিজে, এবং আর একটু বাড়ালেই জল হয়, তখন অশ্রুর সৃষ্টি। সেই সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রেম চন্দ্র দেখ্‌তে যে মনের আর্দ্র ভাব হয়, তাহা ক্রমশঃ ঘন হইয়া মেঘ হয়, এবং আরও একটু ঘনতর হইলে, উপযুক্ত সময়ে বায়ুর আঘাতে তাহা হইতে জল পড়ে। ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিলে ক্রমে সেই ঘন প্রেম আসে, খুব ঘন হইলেই চক্ষে জল আসে। এই জল পূর্ব্বকৃত পাপের অনুতাপ, কিংবা শোক দুঃখ জন্য নহে, ইহা কেবল বর্ত্তমান কালে ঐ প্রেম দেখিয়াই হয়। প্রেমচন্দ্র দেখিবা মাত্র ভক্তি অবাক্, স্পন্দহীন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আরাম, অথবা একটি স্নিগ্ধভাব আসিল। সেই ঠাণ্ডা আসে কেন? যদি দূরে

বৃষ্টি হয় আমারা এখান থেকে ঠাণ্ডাতে বুঝি, এখানেও বৃষ্টি আস্‌বে। সেইরূপ যখন প্রাণ স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা হয়, তখন বুঝিতে হইবে, অশ্রুপাতরূপ বৃষ্টি পরে আসিবে। তুমি কি জলবাদী হবে? জল ব্রহ্ম, জল পবিত্রাণ, জল ধন। জলকে এত বাড়াইবে? হাঁ বাড়াবে। জল ভিন্ন কি চিত্ত শুদ্ধ হয় না? জল ভিন্ন কি ভক্তি হয় না? হে ভদ্র, এরূপ প্রশ্ন করিবে না। নিশ্চয় জেন জল ভিন্ন ভক্তের গতি নাই। যদি বল না কাঁদিলেও আমার প্রেম হয়, জানিও তাহা অপেক্ষা অধিক প্রেম নাই। ভিতরে ভিতরে গূঢ় নিয়ম এই, মূল্য সত্য এই, অশ্রুপাত ভিন্ন প্রেম হয় না, প্রেম থাকে না প্রেম বাড়ে না, অশ্রুপাত সামান্য মনে করিও না। এক ফোটা অশ্রুপাতকেও এক সহস্র মুক্তা অপেক্ষা মহামূল্য জ্ঞান করিবে। ভিন্ন প্রকার অশ্রু-জলের ভিন্ন ভিন্ন দাম প্রেমবিজ্ঞানের অধ্যাপক যাঁহারা তাঁহার নির্ণয় করিতে পারেন। কোন সোণা বার টাকা এবং কোন সোণা ষোল টাকা দরের। বাস্তবিক চক্ষের প্রেম অশ্রু অত্যন্ত মূল্যবান, স্বর্গের দেবতাদিগের পক্ষে অত্যন্ত আদরণীয়। প্রেম চাও কিন্তু প্রেম আছে অথচ প্রেমাশ্রু নাই, সে প্রেম চাই না। মেঘ হতে পারে অথচ বৃষ্টি নাও হতে পারে; কিন্তু খুব ঘন হল অথচ বৃষ্টি হল না, এমন হয় না। এই জন্য বলি ঘন প্রেম চাই। প্রেম যদি পাতলা থাকে জল হবে না। অশ্রুপাত ভক্তিশাস্ত্রে

মহামূল্য বস্তু। এক দিন চক্ষু হইতে এক ফোটা প্রেম জল পড়িলে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিবে। যত্নের সহিত প্রেমাশ্রু সাধন কর। সেই প্রেমচন্দ্রের স্নিগ্ধ ঘনীভূতভাব দেখিলেই অশ্রুপাত হইবে।

অন্যের ভক্তিভাব দেখিয়া নিজের ভক্তি না হইলেও যে অশ্রুপাত হয় তাহাতে সৌভাগ্য মনে করিবে, কারণ এ অবস্থায় প্রেম শীঘ্র আনা যায়। প্রেমাশ্রু আনন্দাশ্রু শোকাশ্রু সঙ্গে থাকিলে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চার হয়। অশ্রু বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে।

বৈরাগ্য কি ?

হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি অতি যত্নের সহিত বৈরাগ্য সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ এবং সাধন করিবে। বৈরাগ্য ব্যতীত তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। যথার্থ বৈরাগ্য চিনিয়া লইবে। প্রকৃত, অকৃত্রিম বৈরাগ্য বাছিয়া লইবে। পৃথিবীতে অনেক প্রকার কল্পিত বিকৃত মিথ্যা অযথার্থ বৈরাগ্য আছে, সে সকল তুমি গ্রহণ করিবে না। যিনি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হন, অঙ্গে ভস্ম মাখেন, পরের সঙ্গে কথা কহেন না, তিনিই যে বৈরাগী তাহা নহে। বাহ্যিক এমন কোন লক্ষণ নাই যাহা দ্বারা বৈরাগ্যকে জানা যায়। বৈরাগ্য অন্তরের ধন। এক জন বাহিরের সম্পদ ছাড়িল, সেই কি

বৈরাগী? তুমি বলিবে, না। কেন না কাহারও পক্ষে সম্পদ ছাড়িলেও বৈরাগ্য হয় না, আর কাহারও সম্পদের মধ্যে থাকিলেও বৈরাগ্য হয়। আন্তরিক বৈরাগ্য প্রতি-জনের হৃদয়ে স্বতন্ত্র প্রকারে অবস্থান করে। এক দেশে এক সময়ে এক জনের পক্ষে যাহা বৈরাগ্য, অন্য দেশে অন্য সময়ে আর এক জনের পক্ষে তাহা বৈরাগ্য নহে। এক যুগে যাহা বৈরাগ্য, অন্য যুগে তাহা বৈরাগ্য নহে। এক জনের পক্ষে তাহার যৌবনে যাহা বৈরাগ্য, তাহার বৃদ্ধাবস্থায় তাহা বৈরাগ্য নহে। তবেইত বাহ্য লক্ষণ দ্বারা বৈরাগ্য চেনা কঠিন হইল। বিরাগ-সম্ভূত ভাবই বৈরাগ্য। পৃথিবীর অসার সুখের প্রতি যে বিরক্তভাব তাহাই বৈরাগ্য। উদাসীনতা প্রথমে, বৈরাগ্য পরে। উদাসীনের অবস্থায় কিছুরই প্রতি মমতা নাই, অনাসক্ত নিরপেক্ষ ভাব, এই সংসার ভালও নহে, মন্দও নহে। কিন্তু এই ভাব যখন পরিপক্ক হয় তখন অসার বস্তুর প্রতি বিরক্তি হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। কেবল দেখ্‌-লাম না, মজ্‌লাম না তাহা নহে; কিন্তু এই ভাব যখন পরিপক্ক হয় তখন অসার বস্তুর প্রতি বিরক্তি হয়। তখন সংসার কেবল অসার নহে; কিন্তু বিরক্তিভাজন, এই বিরক্তি হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। কেবল দেখ্‌লাম না, মজ্‌লাম না তাহা নহে; কিন্তু বিরক্ত। মত্ত হলাম না ইহা ঔদাসীন্য, ভাল লাগ্‌ছেনা ইহা বৈরাগ্য। অমুক

ব্যক্তি বৈরাগী কি না বাহিরের লক্ষণ দ্বারা জানা যায় না। ভিতরের যে বৈরাগ্য সে কি? বৈরাগ্যের হেতু কি? মনুষ্য কেন বৈরাগী হয়? এক অসার বলে সংসারকে ভাল না বাসা, আর এক সংসার ইন্দ্রিয়াসক্তির উত্তেজক, পাপের কারণ এই জন্য সংসারকে ঘৃণা করা, তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত যদি না হওয়া যায় তদ্দ্বারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জগতের মঙ্গল করা, এই তিন ভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তৃতীয় প্রকার বৈরাগ্য ভক্তিবিভাগের। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য যোগশাস্ত্রের। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য বৈরাগী হওয়া এইটি ভক্তির ব্যাপার। যোগশাস্ত্রের বৈরাগ্য মিথ্যা এবং আসক্তি পরিত্যাগ। জ্ঞানগত বৈরাগ্য দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করিয়া লইবে। সংসারকে বলিবে, সংসার! যদি তুমি চির সঙ্গী না হলে তবে কেন তোমাকে নেব? দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানগত বৈরাগ্য দ্বারা পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য, ধর্ম্মতঃ উপকার লাভ করিবার জন্য, সুখের আসক্তি পরাজয় করিবে। তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সুখের প্রতি বৈরাগ্য অবলম্বন কর, তোমার পাপ অতি অল্প হইবে। তুমি কি মনে কর, ধর্ম্ম এত উদার (উদার শব্দ পার্থিব অর্থে ব্যবহৃত হইল) যে খাওয়া, পরা, এবং অন্যান্য সাংসারিক সুখভোগসম্পর্কে তোমাকে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিবেন? ধর্ম্ম কি ইহার আশ্রিতদিগের অপর্য্যাপ্তরূপে

ইন্দ্রিয়সুখভোগ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সুখের ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন ? না। ধর্ম্ম গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন, "অপার ইন্দ্রিয়সুখ আমি কোন সাধককে দিই নাই, দেওয়া উচিত নহে।" যাই একটু ভাল খাওয়া, কিংবা ভাল জায়-গায় থাকা, কিংবা পারিবারিক আমোদ পাপের দিকে মনকে ঝোঁকায়, তখনই মহাবীর বৈরাগ্য আসিয়া হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া বলিবে, একটি চুলের অপর দিকে যাইতে পারিবে না। মন যদি একটু সুখের দিকে গড়িয়ে যায় সে সময় অত্যন্ত সাবধান হইবে। যখন মন ধর্ম্মের গুরুত্বশূন্য হয়, সেই শিথিলতার সময়, সেই ঘনতর অভাবের সময়, হয়ত ভাল আহার করা, ভাল কাপড় পরা, প্রিয় বন্ধুদিগের সঙ্গ, স্ত্রীপুত্রাদির সেবা, যশ মান ভোগ করা, এবং পাপ করা সমান হইবে। এক সময় যাহা নির্দ্দোষ ছিল, সেই সময় তাহা পাপের কারণ হইল। পাপের কারণ কি ? ইন্দ্রিয়-সুখ। ইন্দ্রিয়সুখ ত নির্দ্দোষ, তাকে ছেদন কর্‌লে কেন ? না, এখন সে নির্দ্দোষ নহে। বৈরাগ্য অতি গম্ভীর, অতি নিষ্ঠুর, বৈরাগ্য আত্মনিগ্রহ। বৈরাগ্যের আদেশে অনেক সময়ে সুখকে ইচ্ছাপূর্ব্বক নাশ করিতে হয়, ভোগেচ্ছাকে কঠোর ভাবে নির্যাতন করিতে হয়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়-সুখ পাপের কারণ নহে তখন তাহা সেবনীয়। যদি ভাল খাওয়া, ভাল পরার ভিতরে পাপের বীজ না থাকে, তবে ভাল খাও, ভাল পর, তাতে ক্ষতি কি ? যে ইন্দ্রিয়সুখ

তোমার যোগধর্ম্মের প্রতিকূল, যাহাতে মন বিকৃত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই পরিত্যাজ্য। কোন সময় হয় ত কাল-পেড়ে ধুতি পরা, কিংবা ভাল তরকারি দিয়া তৃপ্তির সহিত আহার তোমার গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু চিরজীবনের জন্য নহে। সেই সময় অতীত হইলেই সেই অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, এবং আবার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়সুখের ভূমি বিস্তৃত হইবে। সুখভোগ নিষেধ কখন? যখন তাহা ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক, অথবা যখন তাহা সেবন করিলেই পতন হয়। অতএব যে শাসন, যে ইন্দ্রিয় সংযম, যে আত্মনিগ্রহ, অথবা যে বিষয়বিরাগ দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখকে পাপের কারণ হইতে দেওয়া না হয়, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। বৈরাগ্য কি যেমন জানিলে, বৈরাগ্যের পরি-মাণও জানিলে। যে কথাতে বৈরাগ্যের অর্থ প্রকাশ হইল সেই কথাতেই বৈরাগ্যের পরিমাণ বুঝিলে। কত দূর নির্দ্দোষ সুখ আমোদ ভোগ করা উচিত তাহা জানিলে। বৈরাগ্য কি জন্য তাহাও বুঝিলে। অতএব বৈরাগ্য শাস্ত্র যখন পাঠ করিবে, বৈরাগ্যসাধনার্থ সকলের জন্য যে এক বিধি কদাচ ইহা বিশ্বাস করিও না। বৈরাগ্য আপেক্ষিক, বৈরাগ্য তুলনার ব্যাপার, এক জনের পক্ষে যাহা বৈরাগ্য অন্যের পক্ষে তাহা বৈরাগ্য নহে। যেন তেন প্রকারেণ যে প্রকার শাসন দ্বারা তুমি ইন্দ্রিয়সুখকে পাপের কারণ হইতে না দিতে পার, তাহাই বৈরাগ্য, এবং তাহাই তোমার

পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। মনকে কখনও শিথিল হইতে দিবে না, সর্ব্বদা জমাট রাখিবে। প্রতি দিন এরূপ করিয়া দেখিবে, নিক্তির ওজনে মন সংসারের দিকে ঝুঁকি-তেছে কি না। আত্মাকে কঠোর নিষ্ঠুর করে রাখা, লোহা গরম করে মনকে ছেঁক দেওয়া, যোগশাস্ত্রের বৈরাগ্য এবম্প্রকার। খুব আগুন দিয়ে মনকে পোড়াবে। যোগশিক্ষার্থী, শিথিলতা, অস্থিরতা, অত্যন্ত সুখাসক্তি তোমার পক্ষে পাপ। অধিকসুখাসক্তিরূপ ভয়ঙ্কর জ্বর এবার আস্‌বে, আত্মচিকিৎসক হইয়া যদি বুঝিতে পার, তবে পূর্ব্বেই অধিক মাত্রায় বৈরাগ্য ঔষধ সেবন করিবে, শরীর মনকে খুব সংযত করে রাখিবে। এ দিকে যাব না, ওদিকে যাব না, এ পুস্তক পড়িব না, ওর সঙ্গ করিব না. এই প্রকার ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অপবিত্র সুখের কারণ হইতে আপনাকে রক্ষা করাই প্রকৃত বৈরাগ্য।

ঔদাসীন্য কাহার কাহার স্বভাব-সুলভ; কিন্তু বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ্য। বহু কাল কোন উপাদেয় সামগ্রী ভোগ করিতে করিতে যে তাহার প্রতি আসক্তি জন্মে, সেই আসক্তিবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ব্বভুক্ত সুখের প্রতি বিরক্তি এবং ঘৃণা তাহাই বৈরাগ্য।

বিশেষ কর্ত্তব্য—স্বাস্থ্য এবং প্রাণভূমির সীমার বহি-র্ভূত স্থানে বৈরাগ্য আরম্ভ হয়। শরীররক্ষার্থ যে সকল নিয়ম পালন করা অত্যাবশ্যক; সেই রাজ্যে বৈরাগ্যের

অধিকার নাই। এই স্থানে বৈরাগ্যের কথা যে আনয়ন করে, সে ঈশ্বরের শত্রু। যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ হয় তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা ঈশ্বরের বিধিলঙ্ঘন।

ভক্তির উচ্ছ্বাস।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, চন্দ্রদর্শনে অনুরাগ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাস হয় ইহার উপমা ভৌতিক জগতে দেখা যায়। চন্দ্রের আকর্ষণে জল স্ফীত হয়, ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্রে কথিত আছে। সেই জল প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া যেখানে যেখানে পথ পায় সে সকল স্থান পূর্ণ করে। পূর্ণিমার সময় জোয়ারের অত্যন্ত তেজ হয়। বান্ ডাকলে কেহ নিকটে তিষ্ঠিতে পারে না। প্রেমচন্দ্র, ব্রহ্মচন্দ্রের আকর্ষণে নিদ্রিত প্রেমনদীর উচ্ছ্বাস হয়, এবং যখন সেই প্রেমচন্দ্রের পূর্ণিমা হয়, তখন সেই প্রেমনদীর উচ্ছ্বাসের স্রোতের এমনি প্রবলবেগ হয় যে, তাহার নিকট কোন বাধা বিঘ্ন তিষ্ঠিতে পারে না। লজ্জা, ভয়, এ সমুদায় বাধা সেই উচ্ছ্বাসের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। স্বার্থপরতা, অহঙ্কার প্রভৃতি পাপরাশি সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। পূর্ণিমার জোয়ার সমস্ত জীবনকে প্লাবিত করে। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, এই বান্ ডাকছিল অল্প স্থানে, দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে এত জল আসিল। এক বিন্দু প্রেম দেখিতে

দেখিতে সিন্ধুর মত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ প্রাণে এত ভক্তির ভাব হইত না, কোথা হইতে ভক্তির নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রেমিক ভক্ত জন এইরূপে আপনার ভাব দেখিয়া আপনি চমৎকৃত হন। এই উচ্ছ্বাসের অন্য কোন কারণ নাই, কেবল চন্দ্রের আকর্ষণই ইহার কারণ। কেবল বুদ্ধি, বিবেচনা, কিংবা ভাবনা দ্বারা তাহা হইবে না। পূর্ণচন্দ্রের আকর্ষণে যখন সমুদ্রে উচ্ছ্বাস হয়, তখন ক্ষেত্রের উপর দিয়া জল যায়, এবং নদী কূপ ইত্যাদি সমুদায় পূর্ণ করে, পূর্ব্বে যেখানে জল যেত না, সেই উচ্চ স্থানেও জল যায়। কিন্তু যদিও এই উচ্ছ্বাস সর্ব্বদা থাকে না, তথাপি বারংবার উচ্ছ্বাস দ্বারা ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়, ভবিষ্যতে ফলপ্রসবের পক্ষে প্রচুর ক্ষমতা লাভ করে। সেইরূপ বারংবার ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় কোমল এবং আর্দ্র হয়, এবং তাহা হইতে শান্তি, আনন্দ, আশা, বিনয় ইত্যাদি ফল প্রসূত হয়। জিজ্ঞাসা করিতে পার, এই যে ভক্তিজোয়ার আসে, এই স্রোত কি মনের সমুদায় পাপ দুঃখ টেনে নিয়ে যেতে পারে? ভাটার অবস্থায় যত মলিনতা জমিয়া থাকে সমুদায় কি ধৌত করিয়া লইয়া যায়? হাঁ, জলের তোড়ে সমুদয় মলিনতা চলিয়া যায়। কিন্তু উপরিভাগে যে স্রোত চলে, তাহা গভীর জলরাশির নিম্ন স্থানে যে সকল জঞ্জাল মলিনতা থাকে, তাহা ধৌত করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সামান্য প্রেমের উচ্ছ্বাসে যে সকল জঘন্যতার

বীজ হৃদয়ের অত্যন্ত নিম্নদেশে আছে, সে সমুদায় যায় না। এ সকল নিম্নতম স্থানের অপবিত্রতাও যায় যদি নদীর সমস্ত ভাগে স্রোত হয়। যখন প্রেম ও ভক্তির অত্যন্ত প্রাবল্য হয়, তখন ভিতর পর্য্যন্ত মধুময় পুণ্যময় হয়। ভক্তির জল জীবনের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্নতম মন্দ ভাব সকলও বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে। প্রকৃত ভক্তি পাপকে ভস্ম করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য, সুখ এবং আহ্লাদ আনিয়া দেয়। সেই প্রেমচন্দ্র দেখিতে দেখিতে আনন্দ এত অধিক হয় যে আর ঈশ্বরবিরুদ্ধে কোন ভাব থাকে না। ঈশ্বরের প্রতি এত অধিক প্রেম হয় যে তাহার তরঙ্গে সমুদয় শত্রু ভেসে যায়। সেই চন্দ্রের আকর্ষণে উচ্ছ্বাস হয় আপনি, ব্রহ্মবিরুদ্ধ ভাব যায় আপনি।

যদি দেখ সেই প্রেমচন্দ্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে জল বাড়্‌ল না, তবে আরও ব্যাকুল হইয়া সেই চন্দ্র দেখিবে। জল বাড়্‌ল কি না দেখ্‌বে কেমন করে? চক্ষু একটী পুষ্করিণী। প্রেমজলে সেই পুষ্করিণী পূর্ণ হইল কি না দেখিলেই বুঝিবে। তাহাতে জল দেখিলে বুঝিবে পূর্ণিমার জোয়ারের জল এসেছে। অল্প পরিমাণে যে জল, তাহাতে পবিত্রতা আনন্দও অল্প। তাহাতে মনের কতকগুলি অংশ থাকিবে যাহা প্লাবিত হবে না। কিন্তু যত দূর জল তত দূর শুদ্ধ করিয়া দিবে, মোহিত করিয়া দিবে। সেই প্রেমচন্দ্রের দিকে যত দৃষ্টি পড়িবে তত জল বাড়িবে। অল্প জল

হইলে কখনও স্বীকার করো না যে ভালরূপে আকৃষ্ট হইয়াছ। যখন জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণটি শুদ্ধ এবং মধুর হইল তখন বলিবে যে হাঁ; ইহাতেই প্রাণ তৃপ্ত হয়। এক দিকে প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে ভক্তিসিন্ধু উথলিত হয়, অন্য দিকে মনের ভাব বাষ্প হইয়া উপরে ঘন মেঘাকার ধারণ করিয়া আবার বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এইরূপে ক্রমাগত নিয়ে জল বৃদ্ধি এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ দ্বারা, রাস্তা, বাড়ী, গ্রাম, নগর প্লাবিত হইয়া যায়। পুরাতন জীবন নষ্ট হয়, এবং নূতন ভক্তি, মগ্নভাব, এবং জীবনের সঞ্চার হয়। এই প্রকার ভক্তিশাস্ত্রে জলবৃদ্ধি, জলবর্ষণ, প্রেমবারি, ভক্তিসিন্ধুর ব্যাপার। ভক্তিরাজ্যে বান্ ডাকে, বৃষ্টি হয়। ভক্তিশাস্ত্র জলের শাস্ত্র।